দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বাজার হারানোর হতাশায় তিল থেকে তাল — পৃঃ ২৪

মহারাষ্ট্রে অপমৃত্যু ঘটা একটি পরম্পরার পুনর্জন্ম হলো — পৃঃ ১৩

৭৪ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ১৮ জুলাই, ২০২২।। ১ শ্রাবণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ১ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৮ জুলাই - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, তবু মমতাকেই অনুসরণ মহুয়ার
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দুর্বলতা দীর্ঘজীবী হোক ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সিনজো আবের উত্তরাধিকার পৃথিবীতে দীর্ঘতর হবে
☐ নরেন্দ্র মোদী ☐ ৮

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর প্রেক্ষাপট মনে রাখাই আজ বাঁচাতে পারে বাঙ্গালি হিন্দুকে ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালির দীর্ঘমেয়াদি বন্ধ্যাত্ব
☐ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ☐ ১১

মহারাষ্ট্রে অপমৃত্যু ঘটা একটি পরম্পরার পুনর্জন্ম হলো
☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ১৩

সিরাজের পরাজয়ে বাঙ্গালির পরাজয় নয়
☐ কুশল বরণ চক্রবর্তী ☐ ১৬

রাশিয়ার তেলে মধ্যপ্রাচ্যের আপত্তি ☐ অনঙ্গদেব মিত্র ☐ ২৩

বাজার হারানোর হতাশায় তিল থেকে তাল
☐ ভবানীশঙ্কর বাগচী ☐ ২৪

তেলা মাথায় তেল দিতে নারাজ ভারত
☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৬

নাগপঞ্চমী একটি সর্বভারতীয় পূজা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করেন শ্রীমল্লিকার্জুন ☐ সূর্যশেখর হালদার ☐ ৩৩

ইতিহাস বদলে দিতে পারে সিনাউলির রথ
☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ৩৫

রাষ্ট্র পুনর্গঠনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রশক্তির ভূমিকা
☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩৭

প্রথম মহাযুদ্ধে আত্মবলিদান করা ভারতীয় সৈনিকরা আজও অবজ্ঞাত ☐ কৌশিক রায় ☐ ৪৩

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনে রাজ্য সরকার উদাসীন কেন? ☐ শ্যামল কুমার হাতি ☐ ৪৪

শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে কোভিড
☐ বরুণ দাশ ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

ফ: ১

প্রকাশিত হবে
২৫ জুলাই
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চীনের ফাঁদে ভারতের প্রতিবেশীরা

ঋণের ফাঁদ পেতেছিল চীন। সেই ফাঁদে পা দিয়েছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার। চীনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে এইসব দেশ ভেবেছিল খুব সহজেই অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে। তার জন্য দেশের অংশবিশেষ চীনের হাতে তুলে দিতেও এরা পিছপা হয়নি। এর কুফল আজ শ্রীলঙ্কায় দেখতে পাচ্ছি। শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হয়ে গেছে। পাকিস্তানও সেই পথে। প্রশ্ন হলো, প্রতিবেশীরা দেউলিয়া হয়ে গেলে ভারত স্বস্তিতে থাকতে পারবে কি?

আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায় এরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে। লিখবেন— চন্দ্রভানু ঘোষাল, সত্যপ্রকাশ ন্যায়মূর্তি প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০্ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**

A/C. No. : **0954000100121397**

IFS Code : **PUNB0095400**

Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK VIVEKANAND ROAD Kolkata - 700 006**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মানবতার পক্ষে বড়ো হুমকি

বর্তমান ভারত জাগ্রত ভারত। নব ভারত। কাহারও চোখ রাঙানিতে এই ভারত দমিবার পাত্র নহে। সম্প্রতি নূপুর শর্মা ইস্যুতে ইসলামিক দেশগুলি ভারতের নিন্দা করিয়া ভারতের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাহারা তাহাদের ভুল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহাদের সহিত ভারতের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হইল তেল। মধ্যপ্রাচ্য হইতে বিশ্বের সবচাইতে বড়ো তেল আমদানিকারক দেশ হইল ভারত। কিন্তু ভারত ইতিমধ্যেই তেলের নির্ভরযোগ্যতা মধ্যপ্রাচ্য হইতে কমাইয়া রাশিয়ার দিকে ঝুকিয়াছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে গম রপ্তানি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। ইহাতেই টনক নড়িয়াছে তাহাদের। নূপুর ইস্যুর তিনদিনের মধ্যেই ভারত সফরে আসিয়াছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সহিত আলোচনায় তিনি জানাইয়াছেন ভারতের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার বয়কটের পক্ষপাতী তাহারা নহেন। বাণিজ্য যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। মোল্লাবাদীদের চাপে হয়তো তাহাদের তাৎক্ষণিক বিস্মরণ ঘটিয়াছিল যে, ভারত হইতে খাদ্য পণ্য আমদানি না করিলে তাহাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ভারতের মতো দেশ যদি তাহাদের দেশ হইতে তৈল ক্রয় না করে তাহা হইলে তাহাদের অর্থের উৎসও শুকাইয়া যাইবে।

আসলে ভারত বিরোধীদের মাঝে মাঝে বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে যে বর্তমান ভারত পূর্বের ভারত নহে। বর্তমান ভারতের নিজস্ব শক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা রহিয়াছে। কারণ বর্তমান ভারতের চালিকাশক্তি একটি শক্তিশালী ও প্রখর জাতীয়তাবাদী সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বের কারণে স্বাধীনতার সত্তর বৎসর পর ভারতীয়দের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রগতি ও বিকাশের পথে তাহারা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরমান। বস্তুত, ভারতের এই জয়যাত্রার সূচনা হইয়াছে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় হইতে। ১৯৯৮ সালে ভারতকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য পোখরানে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় আমেরিকা পদে পদে হুমকি দিয়াছিল। তথ্য, সম্পদ ও প্রযুক্তির উপর তাহারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছিল। আর্থিক অবরোধ, তীব্র আন্তর্জাতিক সমালোচনা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বাণিজ্যের ক্রমাগত পতন— সমস্ত কিছুই রুখিয়া দিয়াছিল বাজপেয়ী সরকার। জাগ্রত, সচেতন ভারতবাসীর সহায়তায়। ভারতহিতৈষী প্রবাসী ভারতীয়রা সেই সময় ভারতের রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন তাহাদের সহৃদয় দানে। ইহার ফলস্বরূপ মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই আমেরিকা তাহার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে, নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইবার নিমিত্ত ভারতবাসীর সহিত প্রবাসী ভারতীয়রাও কটিবদ্ধ হইয়াছেন। এই মুহূর্তে ৩ কোটি ১০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় বিশ্বের ১৩৬ টি দেশে বসবাস করিতেছেন। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে দেখা গিয়াছে ২০১৮ সালে ভারতে সবচাইতে বেশি অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়রা। প্রবাসী ভারতীরা তাঁহাদের দক্ষতা, পরিশ্রম ও শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের এক ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন সমগ্র বিশ্বে। নূপুর ইস্যুতে ইসলামিক দেশগুলি তাৎক্ষণিক ভারতের নিন্দা করিলেও প্রবাসী ভারতীয়-সহ বিশ্বের ৪৬ টি দেশ ভারতকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ভাবিবার বিষয় হইল, ইসলামিক দেশগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টিতে বিরতি টানিলেও ভারতের ইসলামপন্থীরা যুক্তিতর্কের ধার না ধারিয়া হত্যালীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। সেকুলারবাদী বুদ্ধিজীবী ও মোদী বিরোধী রাজনীতিকরা ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রাখিয়া নিশ্চুপ রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ধর্মের খোলসে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডবকে সমর্থন করিতেছেন। তাহারা ভুলিয়া যাইতেছেন, এই তাণ্ডব মানবতার পক্ষে এক বড়ো হুমকি।

সুভাষিতম্

গুশব্দান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দান্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।।(শ্রীশ্রী গুরুগীতা-২০)

‘গু’ শব্দের অর্থ অন্ধকার, ‘রু’ শব্দের অর্থ নিরোধক। অন্ধকার বা অজ্ঞানতাকে যিনি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনাশ করেন তাঁকেই ‘গুরু’ বলা হয়।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী তবু মমতাকেই অনুকরণ মহুয়ার

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম লিখব না। গুরুত্ব পেয়ে যাবে। পরে ভাবলাম প্রতিবাদটা করে রাখি। কারণ চোরারা ধর্মের কাহিনি শোনে না। তৃণমূলের 'শিশু' সাংসদ মহুয়া মৈত্র ভুলকে ঠিক বলে আস্ফালন করেন। শিশুরা দোষ স্বীকার করে না। মাত্র বারো বছর আগে রাজনীতিতে হাতে খড়ি মহুয়ার। ছিলেন রাহুল গান্ধীর সেপাই। আপাতত মমতা ঘরেই ঠাঁই। একবার বিধায়ক। একবার সাংসদ। তবে মস্তিষ্কের উর্বরতা অধরা থেকে গিয়েছে। তৃণমূল তাঁকে গুরুত্ব না দিলেও কংগ্রেসের কিছু বিতর্কিত নেতা তাঁকে মদত দেন। কারণটা লেখা যাবে না। সম্প্রতি কালীঠাকুর নিয়ে একটি অযাচিত আর ভুলে ভরা মন্তব্য করেন মহুয়া। মহুয়া সংস্কৃত পড়েননি। জানেনও না। 'মধুযাবৎপিবাম্যহম্' বাক্যটি তাঁর কাছে গ্রিক, লাতিন আর হিব্রুর মতো দুর্বোধ্য। আমেরিকার একটি কমিউনিটি কলেজে তাঁর শিক্ষা। কোনো প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কিছুদিন কাজ করেছিলেন একটি অর্থলগ্নি সংস্থায়। তাই 'করপোরেট'-এর ওপর চালাকিটা রপ্ত করেছেন। এখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালি আর ভদ্রলোক রয়েছেন যাঁরা আজও ঔপনিবেশিক ক্রীতদাস। তাঁরা বিদেশি পদলেহন করে গৌরববোধ করেন। সমালোচনা শুনলেই জেনোফোবিয়ার কথা বলেন। মহুয়ার আড়ষ্ট ইংরেজি বলা তাঁরা আগ্রহভরে গ্রহণ করেন। তাই বিদেশি শিক্ষাকে সামনে রেখে অবান্তর কথা বলেন মহুয়া। কালিকাপুরাণ বা শ্রীশ্রী চণ্ডী পড়ে বোধগম্য হওয়ার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নেই। মহুয়া শোনা কথা আর শেখানো বুলির উপর নির্ভর করে নিজেকে শক্তির উপাসক বলে তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ক্যানাডাতে বিকৃত মস্তিষ্ক এক পরিচালকের 'স্মোকিং কালী'র চিত্রায়নের বিষয় বলতে গিয়ে মহুয়া তাঁর অবুদ্ধির ঝাঁপি খুলে বসেন। মা কালী বিষয়ে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা শ্রোতদের কাছে উজাড় করে দেন। দুর্ভাগ্য যে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পরে বুঝতে পারি তাঁকে সাজিয়ে গুজিয়েই বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। টার্গেট বিজেপি।

আচমকা কিছুই হয়নি। তৃণমূলের এক নেতা পরে আমাকে বলেন, 'স্পেকিং কালীকে কেবল নিন্দা করলেই ফুরিয়ে যেত। ওখানে মহুয়ার নিজের মতটা অর্থহীন ছিল। দলে নম্বর বাড়াতে নিজের উৎসাহে মহুয়া এসব বিতর্ক তৈরি করেছেন।' দক্ষতা বোঝাতে কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় একবার সংসদে চণ্ডী পাঠ করেছিলেন। মহুয়ার সে ক্ষমতা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কালী নিয়ে কিছু সশ্রদ্ধ নিবেদন রেখেছেন। তাতে মহুয়ার অবান্তর বক্তব্য গুরুত্ব পেয়ে যেতে পারে। এটা একেবারেই কাম্য নয়। আমার মতে সাংসদ হিসেবে মহুয়া সংবিধান বিরোধী কাজ করেছেন। জনপ্রতিনিধি আইন আর ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের কাছে তিনি দায়বদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো সাংসদের ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতিকে কটাক্ষ করে কথা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ। তৃণমূল দল তাঁর বালখিল্য বক্তব্যের থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেও কোনো এক 'অজানা কারণে' তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দলীয় ব্যবস্থা নেয়নি। এটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ ওই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমান দোষে দুষ্ট।

অন্য ধর্ম সম্পর্কে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য কিছুদিন আগেই বিজেপির একজন জাতীয় মুখপাত্র সাসপেন্ড হয়েছেন। অনেকে বলছেন মহুয়া তাঁর কাউন্টার দিতে গিয়ে আউট হয়ে গিয়েছেন। বিজেপির ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করতে লুক আউট জারি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। অথচ মহুয়ার বেলায় সাত খুন মাফ। মহুয়ার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। তা করেছে এই রাজ্য আর মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতারা। মমতা ওসব তোয়াক্কা করেন না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল বলায় চিরকাল পারদর্শী তিনি। মহুয়া তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ইতিহাস ভূগোল তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।

১০০ বছর পর আলিপুর জেলে বিপ্লবগুরু ঋষি অরবিন্দকে ফাঁসি দেন। প্রয়াত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে ফলের রস খাওয়ান। রাশিয়ার চিঠি লিখতে কবিগুরুকে রাশিয়া পাঠিয়ে দেন। না জেনে 'ডহর' বা রাস্তাকে 'বাবু' বলে ডাকেন। ভগিনী নিবেদিতাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যা বলেন। ঠিক এসব কারণে বলতে বাধ্য হচ্ছি মমতা অনেক সময় নিজে ভুল বলেন কিন্তু ক্ষমা চান না। এটা দুর্ভাগ্য তাঁকে অনুকরণ করছেন মহুয়ার মতো কিছু খুচরো নেতা। কিছু অনৈতিক কাজের জালে ফেঁসে মমতাকে শ্রীশ্রীসারদামা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন নির্মল মাঝির মতো বিতর্কিত চরিত্র। মমতা বুঝছে না মানুষ তাঁকে নিয়ে হাসছেন। ঠাট্টা করছেন। তবে তাঁর সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। তিনি জানেন যতদিন দলের রশি তাঁর হাতে না আসে এই দুষ্ট গোরুদের তাঁকে পালন করতেই হবে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভরে থাকবে এই রাজ্য। ☐

দুর্বলতা দীর্ঘজীবী হোক

শান্তিপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আমার চিঠি রাজনীতিকদের কাছে বেশি যায় বলে আপনারা রাগ করবেন না। আমি জানি, রাগ জিনিসটাই আমাদের আজকাল নেই। আমরা সুখে থাকতে ভালোবাসি। সুখের চেয়ে স্বস্তিতে থাকতে আরও ভালোবাসি। সেটা খুবই ভালো। শান্তি তো সকলেই চায়। কিন্তু শান্তির জন্য আমরা আমাদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছি না তো! আমরা যাকে উদারতা ভাবছি সেটা আমাদের কাপুরুষতা নয় তো!

আচ্ছা নূপুর শর্মা কী বলেছিলেন বলুন তো! আমিও শুনিনি। শোনার চেষ্টা করেছি অনেক কিন্তু তা কোথাও নেই। উবে গিয়েছে। আসলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যাতে বেশি কেউ শুনতে না পায়। তবে আমি যেটুকু শুনেছি, আপনারাও হয়তো শুনে থাকবেন কী বিষয়ে উনি কথা বলেছিলেন। এবং সেটা শোনার পরে নিশ্চয়ই আমার মতো আপনারাও ভেবেছিলেন যে, এ আর নতুন কথা কী! এমন কথা তো আগে অনেকেই বলেছেন। এ নিয়ে বিতর্ক তো নতুন কিছু নয়।

তাহলে এত গোলমাল কেন? যারা গোলমাল করল, আগুন জ্বালাল তারাও কি জানে ঠিক কী বলেছিলেন নূপুর শর্মা? মামলা হয়েছে গোটা দেশে অনেক, পশ্চিমবঙ্গে আবার বেশি, কলকাতা পুলিশ লুকআউট নোটিশ জারি করেছে, মাথার দাম দিয়ে দিয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু কী বলার জন্য যেটা কেউ জানে না। আর যাঁরা জানেন তাঁরা এটাও জানেন যে নতুন কোনো কথাই উনি বলেননি। একটি আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু তিনি যেহেতু বিজেপির নেত্রী ছিলেন তাই তাঁর মুখে ওই কথাগুলো শুনে এত রাগ। সত্যিই এত্ত রাগ। সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়ার মতো রাগ। ছাড়খাড় করে দেওয়ার মতো রাগ।

এবার আসি মহুয়া মৈত্রর প্রসঙ্গে। তিনি যে কথাগুলো বলেছেন সেটাও নতুন কিছু নয়। শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষেরা

হিন্দুরা রাগতে জানে না। হিন্দুরা হুজুগের জন্য অস্ত্রধারী দেব-দেবীর আরাধনা করে। কিন্তু গলা দিয়ে স্বধর্মের অপমানের বিরুদ্ধে গর্জন প্রকাশ পায় না।

অনেকেই দেব-দেবী সম্পর্কে এমন কথা বলে থাকেন। কিন্তু মহুয়া তো সাধারণ নন। তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে এক রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয় একবার মহুয়া খেয়ে আছে কি না প্রশ্ন করেছিলেন। বাবুল এখন অবশ্য মহুয়ার সতীর্থ। বিষয়টা সেখানে নয়। সেই সময় বাবুল যা বলেছিলেন সেটাও এবারের মতো টেলিভিশন চ্যানেলের খোলা মঞ্চে। মহুয়া একজন নারী। তাঁর নামের সঙ্গে নেশাদ্রব্য মহুয়ার মিল খোঁজা অপমানের। সুতরাং তিনি আদালতে গিয়েছিলেন। তাহলে মহুয়া একজন দেবীর সম্পর্কে এরকম কথা বললেন কী করে? তিনিও তো নারী। তাঁকে কি মদ্যপ বলা যায়? আমি মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগের কথা না টেনে একজন নারী আর একজন নারী সম্পর্কে এমন অভিযোগ তুলতে পারে কিনা সেই প্রশ্নটাই শুধু তুলছি। পুজো বা তন্ত্রাচারের নিয়ম না জেনে অনেকেই মদ-মাংসের কথা বলেন। তারা সাধারণ মানুষ কিন্তু মহুয়া তো অসাধারণ। তিনি বাগ্মী। তিনি বিলেত থেকে শিক্ষিত। তিনি সাংসদ। তিনি ইংরেজিতে ঝড় তুলতে পারেন।

এখন অবশ্য মহুয়া নিজেকে 'গর্বিত হিন্দু', 'কালীভক্ত' হিসেবে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। কারণ, তিনি জানেন হিন্দুরা ধর্মভীরু। ধর্মের খাতিরেই ক্ষমা করতে জানে। হিন্দুরা উদারতা দেখাতে গিয়ে কাপুরুষ হতে জানে। জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করতে বলছি না কিন্তু হিন্দু সমাজ সেভাবে মহুয়ার বিরোধিতা করল কই? বরং , ফেসবুকে তাঁকে সমর্থনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন শিক্ষিতের দল। আর সংবাদমাধ্যম? তারা মনেও করল না যে, এমন যে শব্দগুচ্ছ সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটা সরিয়ে ফেলা দরকার। ঠিক যেমন নূপুরের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। কিন্তু না, তারাও জানে হিন্দুরা রাগতে জানে না। হিন্দুরা হুজুগের জন্য অস্ত্রধারী দেব-দেবীর আরাধনা করে। কিন্তু গলা দিয়ে স্বধর্মের অপমানের বিরুদ্ধে গর্জন প্রকাশ পায় না।

পাঠক-পাঠিকা, এখানেই সাহস পায় মহুয়ারা। এর আগেও অনেকে এমন নোংরা কথা বলেছেন। আমরা মুখ খুলিনি, তাই মহুয়া আবার বললেন। এবারও আমরা চুপ থাকায় ভবিষ্যতে আরও কেউ বলবেন। তাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন, দুর্বলতা দীর্ঘজীবী হোক। □

অতিথি কলম

সিনজো আবের উত্তরাধিকার পৃথিবীতে দীর্ঘতর হবে

নরেন্দ্র মোদী

সিনজো আবে জাপানের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ও অবিসংবাদিত নেতা, একই সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম বিজ্ঞ পুরুষ হঠাৎ নিহত হলেন। ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী বন্ধনের এমন আন্তরিক নির্মাতা আর আমাদের মধ্যে রইলেন না। তাঁর মৃত্যুতে জাপান তো বটেই সারা বিশ্বই এক মহান দূরদ্রষ্টাকে হারাল। হায়! আর আমি একইসঙ্গে হারালাম আমার এক প্রিয় বন্ধুকে। মনে পড়ে ২০০৭ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম জাপান সফরের সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই তাঁর সঙ্গে সরকারি সব রকম প্রটোকল ও অনুশাসনের বিধি নিষেধের মধ্যে থেকেই আমাদের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে থাকে।

দু' একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি আমাদের জাপানের তোজি মন্দির দর্শন, সিনকানসেন অবধি একসঙ্গে ট্রেনযাত্রা, ভারতে এসে আমেদাবাদ ও সবরমতী আশ্রমে যাওয়া কিংবা কাশীতে অবিস্মরণীয় গঙ্গা আরতিতে উপস্থিত থাকার মতো স্মরণীয় আনন্দময় দিনগুলির তালিকা দীর্ঘ। আজ মনে পড়ে বিখ্যাত মাউন্ট ফুজি পর্বতমালার কোলে তিনি তাঁর আদি পারিবারিক আবাসে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্থানীয় শাসকের অধীনস্থ সেই আবাস ভ্রমণের স্মৃতি ও তাঁর আতিথেয়তা মনে সদা উজ্জ্বল। মনে রাখতে হবে আমার প্রথম জাপান সফরের সময় অর্থাৎ ২০০৭-১২ তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না আর ২০২০ সালের পর থেকেও তিনি সে পদে নেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব আগের মতোই অটুট ও মধুর ছিল।

আবে সানের (ঘরোয়া নাম) সঙ্গে প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকার ছিল বৌদ্ধিক স্তরে অত্যন্ত উদ্দীপনাময়। তাঁর মধ্যে সর্বদা দেখতাম নতুন কিছু যদি সংযোজন করা যায় তাই নিয়ে অদম্য উৎসাহ ও ব্যক্তিগত গভীর প্রত্যয়। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিদেশ নীতি প্রতিটি বিষয়েই ছিল ব্যক্তিগত সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমেই আমার গুজরাটের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক সমর্থনও আজকের প্রাণবন্ত গুজরাট গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। জাপান ও গুজরাটের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছিল। এই বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের পরিবেশেই কালক্রমে আমাকে তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে ভারত জাপানের মধ্যে পারস্পরিক অংশীদারিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। অতীতের কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক ছোটোমাপের অর্থনৈতিক চুক্তি থেকে সর্বব্যাপী দেশের যাবতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সহায়ক হতে পারে এমন এক বড়ো মাত্রার সার্বিকভাবে গতিময় সমঝোতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দুটি দেশের অবস্থান (ইন্ডোপ্যাসিফিক অঞ্চলে) দুর্বল না হয় এবং আমাদের বাসভূমির আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি এবং উভয়দেশবাসীর মৌখিক সখ্যের আঁচ যাতে সারা বিশ্ববাসী অনুভব করতে পারে সেটা ছিল তাঁর সব সময়ের গুরুত্বের বিষয়।

পারমাণবিক শক্তি চুক্তি সম্পাদন করার মতো এত কঠিন কাজও তিনি সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর দেশবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদনে তিনি সম্পূর্ণ সফল হন। অন্যদিকে ভারতে বুলেট ট্রেন নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে ঋণদানের চুক্তিতে ভারতের পক্ষে সুদের যে হার আবে নির্ধারিত করেছিলেন তার চেয়ে দেশের অর্থনীতির পক্ষে হিতকারী আর কিছু হয় না। ভারত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে নতুন মাইল ফলক তৈরি করার দিশা নির্দেশ ঠিক করেছিলেন সিনজো আবে তা অতুলনীয় সদা কাজে, ভাবনায় বুঝিয়ে দিতেন যে তিনি রয়েছেন ভারতেরই পাশে। ভারতের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের তিনি ছিলেন মহা শুভাকাঙ্ক্ষী। ২০২১ সালে ভারত সরকারের তরফ থেকে তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মান দেওয়া প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করে ভারত-জাপানের পারস্পরিক সম্পর্ক স্তরের আন্তরিক গভীরতা স্পর্শ করেছিল।

আজকের পৃথিবীতে নানা ক্ষেত্রে যে দ্রুতগামী পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। এক্ষেত্রে নিজের সময়ের থেকে এগিয়ে থেকে বর্তমান রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন কী প্রভাব ফেলছে তা বোঝার মতো গভীর প্রজ্ঞা ছিল তাঁর। এ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কী ধরনের পথ বেছে নিতে হবে কীসে সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গল হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা ছিল আবের। ছিল তাৎক্ষণিক ভাবে জনতার পছন্দ নয় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু শেষমেশ দেশের মানুষ ও সমগ্র বিশ্বকে নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নিয়ে আসার বিরল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সুদূরপ্রসারী নীতিগুলি বিশেষ করে Abenomics--- জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। একই সঙ্গে যুব প্রজন্মের উদ্ভাবনীশক্তি এবং নিজের প্রচেষ্টায় বড়ো ধরনের উৎপাদন বা প্রায়োগিক কুশলতায় সংস্থা গড়ে তোলার (entreprenearship) ক্ষেত্রে আবে বিশেষ অনুপ্রেরণার স্থল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অতীতে নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির সুফল জাপানবাসী পাচ্ছে। কাজকর্ম ও রাজনীতিক হিসেবে বৃহত্তর পটভূমিতে জাপান ও ভারতের স্থান নির্ধারণে তাঁর ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণের পর আমার মনে হয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে অন্যান্য দেশগুলির দখলদারি নিয়ে তিনি আগাম

সচেতন ছিলেন। ভারত ও বাকি বিশ্ব এই কারণেই আবের কাছে ঋণী থাকবে যে পূর্বেই বিপদকে চিহ্নিত করেছিলেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বহু বিশ্বনেতার আগেই ২০০৭ সালে ভারতের সংসদে দেওয়া তাঁর তীব্র দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বক্তৃতায় তিনি ভবিষ্যতের পৃথিবীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কী রাজনৈতিক, কী কৌশলগত কী অর্থনৈতিক ভাবে যে এশিয়া প্যাসিলফিককে ঘিরেই আবর্তিত হবে তা ঘোষণা করেছিলেন।

সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যে এই অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে একটি নিরুপদ্রব, নিরাপত্তাময় বলয় তৈরি করার রূপকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ভাবনা ছিল এই সংঘাতের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হবে নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। এই নৈতিক শর্তগুলো যা আবে সর্বদা মান্য করতেন তা হলো সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক সংহতি, আন্তর্জাতিক আইনকানুনগুলি মেনে চলা। একই সঙ্গে এই কাজগুলি করতে হবে সমতার মনোভাব নিয়ে (আমি দাদা, সর্বশক্তিমান এমন নয়) যাতে ভালো কাজের ফলে সঠিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফল অংশগ্রহণকারী সব দেশগুলিই সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে। পারস্পরিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত ছড়িয়ে পড়বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ততই বাড়বে এই নীতি তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

The Quad, এশীয় দেশগুলির নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন ফোরাম, ইন্ডো-প্যাসিফিক সামুদ্রিক সংহতি উদ্যোগ, এশিয়া-আফ্রিকা উন্নয়নের জন্য করিডোর নির্মাণ, সর্বোপরি যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াইয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা সবগুলি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান থেকে বিশ্বের দেশগুলি উপকৃত হয়েছে।

লক্ষ্য করেছি খুব শান্তভাবে বাহ্যিক ঢাকঢোল পেটানো ছাড়াই দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বিধা ও বহির্বিশ্বের সন্দেহ দুটিকেই তিনি নিজ কৃতিত্বে জয় করে জাপানের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, পরিকাঠামো এবং দীর্ঘকালীন ভাবে উন্নয়নের ফলভোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক কৌশলগত অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই গোটা বিবর্তনটাই হয়েছিল আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে ইন্ডো-প্যাসিফিক অঞ্চলে। মরনোত্তর ধন্যবাদ জানাতেই হবে আবেকে তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি আজ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আশাবাদী, একইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বও এর সাফল্য সম্পর্কে আজ আত্মবিশ্বাসী।

প্রসঙ্গত, বিগত মে মাসে যখন আমি জাপান গিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম সে সময়েই তিনি ভারত-জাপান অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। সে সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকশিত স্তরে ছিলেন। ঠিক যেমন বরাবরেই মতোই চনমনে, উৎসাহে ভরপুর, ভয়ংকরভাবে আকর্ষক এক বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ভারত-জাপান যৌথ বন্ধুত্বকে কীসে আরও মজবুত করা যায় এই নিয়ে তাঁর বেশ কিছু মৌলিক চিন্তা ভাবনা ছিল। সেই দিন যখন আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তখন বিন্দুমাত্র কল্পনা করতে পারিনি এটিই হবে আমাদের শেষ দেখা। আমি তাঁর ব্যবহারিক উষ্ণতা, বহু বিষয়ে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, চারিত্রিক সৌন্দর্য ও উদারতার মাধ্যমে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা চিরকাল স্মরণ করব। আমার মনে তার অভাব কোনোদিনই পূরণ হবে না।

আমরা ভারতের মানুষরা তাঁর চলে যাওয়াকে নিজেদের কারুরই বিদায় বলে মনে করছি। কেননা তিনি উদার হৃদয়ে আমাদের নিজের আত্মীয় বলেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের এমনই কার্যকারণ, তিনি নিহত হলেন এমন একটা কাজে ব্যস্ত থাকার সময় যা তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন তা হলো দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। তাঁর জীবন হয়তো অসময়ে কেড়ে নেওয়া হলো কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকার আর প্রেরণা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর প্রেক্ষাপট মনে রাখাই আজ বাঁচাতে পারে বাঙালি হিন্দুকে

সম্প্রতি কলকাতার একটি সংবাদপত্র তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ অতিক্রম করল। যে কোনো সংবাদপত্রের আয়ু শতাব্দী প্রাচীন কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। সেই নিরিখে ওই সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। বিশেষ করে, বাঙ্গলা ও বাঙালির জীবনে সেই সংবাদপত্রের অবদান যেখানে বিপুল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একটি সংবাদপত্রে যেভাবে বুঁদ হয়ে থেকেছে এবং এখনও যেভাবে রয়েছে, যা বাঙ্গলার বৌদ্ধিক মননকে যেভাবে একশো বছর সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তাতে সংবাদপত্রটির কার্যকারিতাই প্রমাণিত হয়।

সম্প্রতি শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বহু গুণী ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষের সমাগম হয়েছিল কলকাতায়। সেখানে সংবাদপত্রের গৌরবময় ইতিহাস পর্যালোচনার পাশাপাশি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে গণতন্ত্র রক্ষায় তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ইত্যাদি নানা গালভরা শব্দও উঠে এসেছে। আমরা অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, এতো কিছু নিপুণভাবে উঠে এলেও পত্রিকা গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকারের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' বইটির কথা কোথাও বিন্দুমাত্র উচ্চারিত হলো না।

বলা বাহুল্য, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত বইটি সমসময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এতটাই যে বছরখানেকের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। বইটির উপজীব্য কী ছিল। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র সরকার লেখেন, 'বাংলায় হিন্দুরা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে নিজেদের গুরুতর ত্রুটি ও দৌর্বল্য সংশোধন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য তাহারা সচেষ্ট হইবে, এরূপ আশাও পোষণ করিতেছি। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সেই কার্যে সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলেই আমার এই গ্রন্থ রচনা সার্থক হইবে।'

বলা বাহুল্য, তার কিছুদিনের মধ্যে স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়েছিল। দেশভাগের মধ্যে দিয়ে বাঙালি হিন্দুর দুরবস্থার এক শেষ হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন, পত্রিকা গোষ্ঠীর বর্তমান কর্ণধারেরা তাঁদের পিতৃপুরুষের এই সুমহৎ কীর্তিকে কী সচেতনভাবেই এড়িয়ে যেতে চাইলেন? কিন্তু কেন?

> **বাঙালি হিন্দুর দুর্ভাগ্য, তাঁদের একদা গর্বের, একদা প্রবল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রটি আজ যে ডালে বসে আছে, সেই ডালই কাটার চিন্তায় ব্যগ্র।**

এই পত্রিকা গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বঙ্গবাসীর অজানা নয়। এই স্বস্তিকা পত্রিকার পাতায় বহুবার তা তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং সেই চর্বিতচর্বণে গিয়ে আর লাভ নেই। কিন্তু যেটা বলা দরকার, পূর্বপুরুষদের কৃতিটুকু ভাঙিয়ে বর্তমান প্রজন্মের উত্তরসূরীরা সেই পত্রিকাগোষ্ঠীকে আজ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় রূপান্তরিত করেছে। এতটাই প্রভাব যে অন্য পত্রিকারও যে ন্যূনতম অধিকারবোধ থাকতে পারে, তা তাঁরা আদপেই স্বীকার করতে চান না। এতে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মানমর্যাদা আদৌ রক্ষা হচ্ছে তো?

পত্রিকার ধারাবাহিক ইতিহাস যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন মোটামুটি আটের দশক থেকে পত্রিকার অধঃপতনের শুরু। পত্রিকার আগাগোড়া জাতীয়তাবাদী মানসিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে সম্পাদকীয় স্তম্ভের মাথায় চিরাচরিত 'বন্দেমাতরম' লেখা থাকা সত্ত্বেও পত্রিকায় বিজাতীয় ভাবনার প্রবন্ধ, আরও ভালোভাবে বললে সংস্কৃতিবিরোধী প্রবন্ধ ছাপা হতে শুরু করে। সম্পাদকীয় দপ্তরে একদল তরুণ নকশাল কর্মীকে বাছাই করে নিয়োগ করা হয়েছিল। সম্প্রতি পত্রিকার শতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রাক্তন এক কার্যনির্বাহী সম্পাদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা যায়, পত্রিকাটির বর্তমান কর্ণধারেরা তাঁকে-সহ পত্রিকার অনেক স্বনামধন্য সাংবাদিককে শতবর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণই জানাননি। তাতে উদ্দিষ্ট সংবাদগোষ্ঠীর প্রাক্তন কর্ণধারও অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। যদিও আজ যেখানে ওই সংবাদপত্রটি পৌঁছেছে, তাতে তাঁর অবদানও কম নয়।

বাঙ্গালির ব্যবসা করার মানসিকতা নেই বলে এমনিতেই দুর্নাম আছে। এই পত্রিকা গোষ্ঠীকে দেখলে তার কারণটা বেশ বোঝা যায়। নিজেদের সুবিধার্থে পূর্বপুরুষের কৃতিত্বকে ব্যবহার করবো, কিন্তু তার মর্যাদা রক্ষা করবো না, বাঙ্গালির সুদিন নষ্টের জন্য এই মানসিকতাই দায়ী। পত্রিকার বর্তমান আর্থিক দুরবস্থা এই তত্ত্বের স্বপক্ষেই কথা বলে।

প্রফুল্ল কুমার সরকার বাঙালি হিন্দুর যে দুরবস্থার আশঙ্কা করেছিলেন, সেদিন তা তো হয়েছিলই, বর্তমানেও সেই আশঙ্কা কিন্তু আরও বেশি করে চেপে ধরেছে। অথচ পত্রিকার বর্তমান কর্তৃপক্ষ কী করলেন? তাঁদের মুখপত্র-স্বরূপ চিরকাল বিদেশে বসে দেশের নিন্দা করা এক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে উড়িয়ে এনে দেশেরই আরেক প্রস্থ কঠোর নিন্দা করলেন। বাঙ্গালি হিন্দুর দুর্ভাগ্য, তাঁদের একদা গর্বের, একদা প্রবল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রটি আজ যে ডালে বসে আছে, সেই ডালই কাটার চিন্তায় ব্যগ্র। □

বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালির দীর্ঘমেয়াদি বন্ধ্যাত্ব

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

১৯৮১ সালের জুন-জুলাই হবে। তখনও গ্রীষ্মের প্রভাব থাকলেও মুম্বাইয়ে তেমন গরম ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের ৪/৫ জন বন্ধু (সহকর্মী)-সহ ২৪/২৫ জন প্রবেশনারি ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্টাফ কলেজ আন্ধেরিতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ডাইরেক্ট রিক্রুট অফিসার হিসাবে যোগদানের পরে এটাই ট্রেনিং কলেজে প্রথম আসা। এসেছি আমার বর্তমান কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের ইটারসি (ভোপালের কাছে) শহর থেকে। ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট। আধা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্লাসের নীরবতা ভেঙে প্রশিক্ষক মিঃ দেশমুখ বলে উঠলেন 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.' আমাদের ব্যাচের বাঙ্গালি অফিসারদের বুঝতে না পারার কথা ছিল না। দেশমুখ সাহেবের বক্তব্যে ছিল বাংলা এবং বাঙ্গালিদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিস্থাপিত হওয়ার পরে বাঙ্গালি বন্ধুদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। কেননা, দেশমুখ সাহেব যা বলছেন তা-তো ভুল কিছু বলেননি, যদিও গোখলে সাহেবের বলা ওই শব্দবন্ধ যা একদিন বাঙ্গালিদের উচ্চতার মাপকাঠি ছিল— তা আজ যেন হীনতায় নিম্নগামী হয়ে নির্মম চাবুকের মতো আঘাত হানছে। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় তীব্র বিদ্যুৎ সংকট ছিল— দিনের বেশি সময়ই লোডশেডিং করানো হতো— এই ইংরেজি শব্দবন্ধ নিরক্ষর লোকদেরও কণ্ঠস্থ ছিল। আর বোম্বের মতো শহরে ওই দুই-মিনিটের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

স্বাধীনোত্তর ভারতে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালিদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড়ো কারণ রাজনৈতিক প্রভুদের বাগাড়ম্বরতা এবং মিথ্যা ভাষণ। যখন বাঙ্গালিরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন, তখনও এমন একটা প্রচার চালিয়ে যাওয়া হতো যেন বাঙ্গলাই শ্রেষ্ঠ। পিছিয়ে পড়ার কারণানুসন্ধান না করে, গোয়েবলসীয় ঢঙে প্রচার চালিয়ে নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ছাড়াও এরা (রাজনীতিবিদরা) সাধারণের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করেছেন, বাঙ্গলাই যেন সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— কলকাতায় যখন ৪ টাকা বাস ভাড়া তখন সুভাষ চক্রবর্তীরা দাবি করতেন, এখানকার বাস ভাড়া পৃথিবীর ন্যূনতম এবং কলকাতায় সবচেয়ে কম খরচে জীবন যাপন করা যায় ইত্যাদি। অথচ ওই ৮০-৯০-এর দশকেও মুম্বইতে মাত্র ২ টাকা ছিল সরকারি বাসে ন্যূনতম ভাড়া এবং হায়দরাবাদে মাত্র ১০ টাকায় পাওয়া যেত নিরামিষ থালি পেটপুরে খাওয়ার জন্য। সেই সময়ও কলকাতার ফুটপাতে ১৮/২০ টাকার কমে পেট ভরা খাবার মিলত না। এই উদাহরণটি দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য— যাঁরা বাড়ির বা রাজ্যের বাইরে যান না তাঁরা অপপ্রচারে নিমগ্ন হলে লাভ রাজনীতিকদের, আর তাতে পিছিয়ে পড়ে বাঙ্গলা।

> **অযোগ্য দলদাসদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব প্রদান, ছাত্রদের অন্যায়, অন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া, ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কলেজ-ফেস্ট করার সংস্কৃতি, ভর্তির ক্ষেত্রে ঘুষ, সর্বশেষে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়ে অযোগ্য, ফেল করা প্রার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে এরাজ্যে শিক্ষার অন্তর্জলী যাত্রার ব্যবস্থা করা হলো।**

তবে হ্যাঁ, সেদিন পর্যন্ত কোথাও যেন বাঙ্গালিদের একটু পা রাখার জায়গা ছিল— যদিও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর 'পিছনের দিকে এগিয়ে যাওয়া' চালু হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষ এবং বাঙ্গালিরা অসৎ নয় এরকম একটি ধারণাই ছিল বাঙ্গালিদের মর্যাদার জায়গা— যা থেকে দ্রুত বাঙ্গলা পিছিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালিরা কর্মবিমুখ, রাজনীতিবাজ এবং ঋণগ্রস্ত এরকম বদনাম থাকলেও, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে বিহার-উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে বাঙ্গলার নাম উচ্চারিত হতো না। বামফ্রন্টের রাজত্বে বৈজ্ঞানিক রিগিঙের নামে বুথ জ্যাম, বুথ দখল, ভোটের ফল প্রকাশের পরে বিরোধীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, তা কিন্তু পূর্বকথিত বিহার-উত্তরপ্রদেশের তুলনায় ছিল নিতান্তই নগণ্য ঘটনা। গত এক দশকে সেই বিহার-উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় নির্বাচন, বিধানসভা এমনকী লোকসভার ভোটেও ব্যাপক কোনো অনিয়ম এবং হিংসার ঘটনা বিরল— নেই প্রাণহানির খবর।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলটির সর্বগ্রাসী ক্ষমতার লোভে রক্তক্ষয়ী হিংসার বলি হয়েছেন অর্ধ-শতাধিক নিরীহ মানুষ, যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে। ২ মে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে মাসাধিককাল ধরে বিরোধী (পড়ুন বিজেপি) দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি সম্পত্তির উপরে হামলা চলে— লুণ্ঠিত হয় মা-বোনেদের ইজ্জত। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে প্রাণের ভয়ে অন্যত্র চলে যান, তাঁদের অনেকে এখনও বাড়ি ফেরার সাহস পাচ্ছেন না। বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের মেরে মৃত দেহ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আত্মহত্যার নামে। অথচ, বিধানসভা ভোটে ৩৮ শতাংশ ভোট পাওয়া দলটি কোনো শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ। বাম-কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরে

ফ ঃ ২

বিজেপির এই ছন্নছাড়া অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে তৃণমূল। গণতান্ত্রিক সব রীতি-নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে মুকুল রায়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান করার মধ্যেই প্রকাশিত এই স্বৈরাচারী মনোভাব। বাঙ্গলায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ কিনা তার নতুন 'মাপকাঠি' তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ আগের নির্বাচনে মৃতের সংখ্যা যদি বর্তমান নির্বাচন অতিক্রম না করে, তবে তা শান্তিপূর্ণ। এরকম একটি মাপকাঠি কিয়ৎপূর্বে একটি নির্বাচনী মামলায় আদালতের অনুমোদন পেয়েছে। বিচারবিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বাঙ্গলার গণতন্ত্র এখন অথই জলে। গণতন্ত্রের মূল শর্ত অবাধ নির্বাচন। নির্বাচকমণ্ডলী যদি নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারেন তাহলে কীসের গণতন্ত্র?

অবশ্য নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাদের কাজ করতে হয় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায়। রাজনৈতিক অনেক বিষয় স্পর্শকাতর হওয়ায়, যথাসম্ভব তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকে। তা সত্ত্বেও বিচারপতিদের বা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। যেমন কিছুদিন আগেই এক নেতা বেনজিরভাবে এক বিচারপতিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টায় এখন জল ঢেলে না দিলে ভবিষ্যতে বিচার বিভাগের জন্যও দুঃসময় আসবে। রাজনীতিই হচ্ছে দুর্নীতির উৎস এবং দলদাস প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এর বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং সমাজ জীবনকে দুষণমুক্ত রাখতে হলে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দায় বিচার বিভাগেরও। তবে সবচেয়ে হতাশার বিষয় এটাই যে, সুশীল সমাজের একাংশ কবি-সাহিত্যিক এবং বৃত্তিভোগী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এই সংস্কৃতির সমর্থক, কেউ কেউ অর্থ লোভে, আর কেউ বা যশ লোভে।

বর্তমান তৃণমূল সরকার দুর্নীতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। দুর্নীতির কোনো অভিযোগে কোনো রাজনীতিকের পদত্যাগ দুরস্থান, বুক ফুলিয়ে তাঁরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন। নারদা মামলার ভিডিয়ো-অডিয়ো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরে তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন সফেদ জামা-কাপড় পরা কালো টাকা নেওয়ার অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীরা, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ওই ভিডিয়ো জাল বলে দাবি করেন। অবশ্য তদন্ত শুরু হওয়ার পরে ঢোকগিলে নেত্রী আবার কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ এত ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলার জন্য সংবাদমাধ্যমকে দোষারোপ করেন। যেমন, ইদানীং সংবাদমাধ্যমে তৃণমূলের কিছু নেতা-নেত্রীর বাড়ি-গাড়ির খবর প্রকাশ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বেশ কুপিত।

ভাইয়েরা ভরসা পেয়ে বড়ো গলায় তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি যে পরিশ্রমার্জিত তার দাবি করছেন। একজন তো আবার গরিব আম্বানীদের বড়োলোক হওয়ার সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করছেন। তবে, গ্যারেজে যে দামি গাড়িগুলি রাখা, সেগুলি অন্যের গাড়ি বলছেন, অর্থাৎ ওগুলো অন্য কারো নামে আছে। এই সিবিআই-ইডি তদন্তের যুগে ভাইয়েরা এতটুকু বুদ্ধি না ধরলে এত সহজে, বিনা লটারিতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ করলেন কী করে। তবে আয়কর দপ্তর আয়ের হিসাব চাইলে যেসব কাগজপত্র দরকার তা এখন থেকেই তৈরি করে রাখলে ভালো করবেন তাঁরা। গাড়িটা যার নামে তার টাকার উৎসও প্রস্তুত রাখলে ভালো, ভবিষ্যতের বিপদের কথা তো বলা যায় না। বামফ্রন্ট রাজত্বের ৩৪ বছরে ২/১ একজনের বেশি অনুজ পাণ্ডের খবর শোনা যায়নি, এখন তাদের দেখা মিলবে সব পঞ্চায়েতে। দুর্নীতির এই জাতীয়করণ এক জাতীয় লজ্জা। আমফানের ত্রাণের টাকা আত্মসাতের হাজারো উদাহরণ থাকলেও কোনো এফআইআর হয়নি বা কারুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রথমদিকে ভয়ে ২/৪ জন টাকা নিলেই সিবিআই, আর ওরা যে হাজার হাজার কোটি টাকা মারছে— তার বেলায়?

গত ১০/১২ বছর ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার যে বিষয়টির সাফল্য দাবি করতে পারে, তা হচ্ছে গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতি, বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য ঢালাই রাস্তা এবং পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এছাড়াও রয়েছে গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা। এ প্রকল্পগুলির মধ্যে সবগুলিই কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত প্রকল্প এবং ব্যয়ভারের বৃহদাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছে। জিএসটি চালু হওয়ার পরে কর ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারের ফলে কর ফাঁকি প্রায় অসম্ভব। এই করোনা প্রকোপের বছরগুলিতে কর্মসংস্থান ব্যাহত এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মধ্যেও জিএসটি থেকে কর আদায়ে কোনো ভাঁটা পড়েনি। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব আয় কেন্দ্রীয় সরকার বণ্টন করছেন রাজ্যগুলিকে। এখন থেকে দু-তিন দশক আগে যা ছিল সমস্ত দেশের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ, তা এখন পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যের বার্ষিক বাজেট। তাই বাজেটের কোটি কোটি টাকা পঞ্চায়েতগুলিকে তো খরচ করতে হবে, যত কাজ তত আয়। কাজের নেশায় পঞ্চায়েত কর্তাদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে, সমাজ সেবার তাগিদে। একশো দিনের কাজের জব কার্ডধারীদের জিজ্ঞাসা করুন (গোপনে) তারা পুরো টাকা পান কিনা। ওদের অনেকেরই হাজিরা দিলেই পয়সা— তাই কাজ না করে 'যা' মেলে তাতেই সন্তুষ্ট, সকলেরই মুখ বন্ধ, মুখ খুললেই নাম কাটা। রাজ্য অনেক ক্ষেত্রেই মাস্টাররোলে প্রথম স্থান অধিকারী, তদন্ত করতে চাইলে বা হিসেব দিতে বললে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ। উলটে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যের নামে চালিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা, সংঘাতের রাস্তায় গিয়ে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার রাজনীতি-ক্ষমতায় টিকে থাকার উপকরণ।

ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া বাঙ্গলায় দীর্ঘমেয়াদি সর্বনাশ শিক্ষার অবনমন এবং পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, যা বাঙ্গলাকে দীর্ঘদিন টানবে। বামফ্রন্টের রাজত্বে শিক্ষায় উচ্চস্তরে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও তা ছিল সীমিত। এই রাজত্বে যা হয়েছে সর্বগ্রাসী। অযোগ্য দলদাসদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব প্রদান, ছাত্রদের অন্যায়, অন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া, ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কলেজ-ফেস্ট করার সংস্কৃতি, ভর্তির ক্ষেত্রে ঘুষ, সর্বশেষে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়ে অযোগ্য, ফেল করা প্রার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার অন্তর্জলী যাত্রার ব্যবস্থা করা হলো। আদালতের নির্দেশে কারও কারও চাকরি গেলেও মুখ্যমন্ত্রীর সদর্প ঘোষণা কারও চাকরি যাবে না, অর্থাৎ বাঙ্গলার ছেলে-মেয়েরা ফেল করা শিক্ষকদের কাছ থেকেই পাঠ নেবেন এবং ভবিষ্যতের মহান বাঙ্গলা গড়ার কারিগর হবেন। এভাবেই দেশমুখদের তীব্র কটাক্ষ দীর্ঘজীবী হবে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

মহারাষ্ট্রে অপমৃত্যু ঘটা একটি পরম্পরার পুনর্জন্ম হলো

দুর্গাপদ ঘোষ

ভাইয়ে-ভাইয়ে ক্ষমতা দখলের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্বও সম্পন্ন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন, 'যুদ্ধ জয়ের আনন্দ কর, কিন্তু মনে রেখো, এই যুদ্ধের খলনায়ক এখনো জীবিত। কখন কী করবে কেউ বলতে পারে না। আপোশ নীতির পরম্পরার একবার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে যে, সে যেকোনো সময় তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। কারণ সে রাজধর্ম মানে না।' মহাভারতের উদাহরণ টেনে আনার প্রেক্ষিত যে মহারাষ্ট্রে প্রায় ভাইয়ে-ভাইয়ে ক্ষমতার দখলের রাজনীতি তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সেখানেও আরও একটা মিনি কুরুক্ষেত্র আপাতত শেষ হয়েছে গত ৪জুলাই। শিবসেনার এক গোষ্ঠী এবং বিজেপির জোট সরকারের আস্থাভোটে বিপুল জয়ের মাধ্যমে। 'আপাতত' এই কারণে যে এখনো যেমন শিবসেনার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘাত মুখিয়ে রয়েছে, তেমনই উদ্ধব ঠাকরের ঘরে-বাইরে রয়ে গেছেন একাধিক খলনায়ক। যাদের কাছে রাজধর্ম কিংবা জোটধর্ম নয়, ক্ষমতাই সর্বোপরি। আপাতদৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রে জোট রাজনীতির আদর্শগত একটা পরম্পরার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল প্রায় দু'বছর সাতমাস আগে। ২০১৯ সালের নভেম্বরের শেষে। হিন্দুত্ববাদী শিবসেনা সেবার একান্ত জাতীয়তাবাদী বিজেপিকে ব্রাত্য করে হাত মিলিয়েছিল মুসলমান তোষণবাদী দল এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে। বালাসাহেব ঠাকরের পুত্র হয়েও উদ্ধব ও তার পুত্র আদিত্য এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা শরদ পওয়ারের কৌশলের ফাঁদে মাথা গলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসেছিলেন। সেদিন একক বৃহত্তম দল হয়েও বিজেপি যখন ঘুঁটে হয়ে পুড়েছিল তখন গোবর হয়ে হেসেছিলেন ক্ষমতাসীন জোট মহাবিকাশ আঘাড়ির নেতারা। ঠাকরে পরিবারও। আদর্শগত রাজনীতির দীর্ঘ পরম্পরার অপমৃত্যু ঘটিয়ে তাকে কবরে পাঠিয়েছিলেন বালাসাহেব ঠাকরের পুত্র।

কোন বালাসাহেব! ১৯৯৫ সাল। বিধানসভা নির্বাচনের শেষ পর্বের প্রচার। মুম্বইয়ের শহরতলি দাদরের বিশাল শিবাজী পার্ক। লক্ষ সমর্থকে টইটম্বুর। যতদূর চোখ যায় গেরুয়ার সমুদ্র। সমর্থনের গর্জন। গেরুয়া রঙের গাঁদাফুলের মালা জড়ানো তির-ধনুক হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক সুঠাম পুরুষ। যেন কুরুক্ষেত্র ময়দানে রথের ওপর গাণ্ডীবধারী অর্জুন।। তির-ধনুক নামিয়ে বক্তৃতা শুরু করবেন কী! শব্দবাজির দাপট, তীব্র উচ্ছ্বাস,

প্রবল উল্লাস থামতেই চাইছে না। তির-ধনুক ১৯৬৬ সালের ১৯ জুন তাঁরই হাতে তৈরি হওয়া শিবসেনার নির্বাচনী প্রতীক। আর এই প্রতীকের অধিকারী শিবসেনাপতি তিনি। স্থির নিশ্চিত, এবার মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে শিবসেনা-বিজেপি জোটই। জনতরঙ্গের উদ্দামতা সামান্য স্তিমিত হতেই মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুরু করল চোখা চোখা শব্দবাণ। যেন একটা একটা জ্যামুক্ত তির। শানিত আক্রমণ। কংগ্রেসের 'মারাঠা ক্ষত্রপ' শরদ পওয়ারকে। সেবার ১৬৯ আসনে প্রার্থী দিয়ে শিবসেনাকে জয়ী করালেন ৭৩টিতে। বিজেপি ১১৬ আসনে লড়ে ৬৫টার দখল নিল। চাইলে সেবারই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। সেটা কেবল বিজেপির চাইতে বেশি বিধায়ক সংখ্যার বিচারেই নয়। ব্যক্তিত্বের নিরিখেও। কিন্তু.....।

মাত্র কয়েকদিন আগে। প্রায় সমমনস্ক দুই রাজনৈতিক দলের পক্ষে হাওয়া যখন তুঙ্গে তখন সংবাদমাধ্যমকে এক সাক্ষাৎকারে কী বললেন! 'শপথ নিয়েছি, ওই কুর্সি কোনোদিন ছুঁয়ে দেখব না। মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, আমি ক্ষমতায় বসার জন্য লড়ছি না। সে বিশ্বাস আমি ভাঙতে পারি না। ভাঙবও না।'

ভাঙেননি তিনি। পরের বিধানসভা নির্বাচন ছিল ১৯৯৯ সালে। জানতে চাওয়া হয়েছিল, প্রয়োজনে শরদ পওয়ারের সঙ্গে জোট করবেন কি না? মুখ থেকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুটে এসেছিল— 'লোকে বলে রাজনীতিটা হলো স্কাউন্ড্রেলদের খেলা। আপনি ভদ্রলোক থাকবেন না স্কাউন্ড্রেল হবেন সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে। .... তবে আমি একজন স্কাউন্ড্রেলের সঙ্গে কোনো কারণেই জোট বাঁধব না। লোকটা অটলবিহারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভবিষ্যতে অন্য কারও সঙ্গে যে করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?' এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সেবছর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর দ্বিতীয়বারের ১৩ মাসের সরকারকে মাত্র এক ভোটে পরাজিত করার নেপথ্যে এই শরদ পওয়ারের ভূমিকাকেই মুখ্য মনে করে থাকেন তথ্যাভিজ্ঞমহল। এখনো। তিনিই নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী গিরিধারী গোমঙ্গকে সংসদে উড়িয়ে এনে ভোট দেওয়ানোর। গোমঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী হলেও তখনো লোকসভা সদস্য ছিলেন।

অনেকে মনে করেন সেনা-বিজেপি সম্পর্কে চিড় ধরেছে আড়াই বছর আগে। উদ্ধব ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি নিয়ে। কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৪ সালে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। শুরু করেছিল বালাসাহেব-পরবর্তী শিবসেনা। তখন থেকেই শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে বাল ঠাকরের আদর্শকে, পরম্পরাকে শিকেয় তুলে রাখার চেষ্টা করেছেন ঠাকরে পরিবার। এখনো বালাসাহেবকে যারা 'অতীত' মনে করেন তাঁরা ২০১৪-তে দেখেছেন, ২০১৯-এ দেখেছেন। এবার ২০২২-এর ২০ জুন থেকেও দেখছেন তিনি অতীত তো নন-ই, বরং আরও অনেক বেশি বাস্তব। তাঁর নামেই শিবসেনা চলছে। তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং তাঁর আদর্শ আঁকড়ে থাকা নিয়ে উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিণ্ডের মধ্যে দলের কর্তৃত্ব নিয়ে চলছে টাগ অব ওয়ার। তাঁর নামের দখল নিয়েই বর্তমানে দুফাঁক হয়ে যাওয়া শিবসেনার দুপক্ষ কীভাবে লড়াই করে যাচ্ছে সেটাও সবাই দেখছেন। এমনকী বিজেপিও তাঁকে বাদ দিয়ে মহারাষ্ট্রে চলতে চাইছে না। কারণ, ২০১৪-১৬ সালেও যে ইংরেজি সংবাদপত্র এক টাকায় বিক্রি হতো সেই 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এ সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে একজন কার্টুনিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করা বালাসাহেব কেবল মারাঠা নয়, হিন্দু জাত্যভিমানের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। ঠিক এই কারণে মহারাষ্ট্রের মানুষ অনেকে শিবসেনাকে সমর্থন করুক না করুক বাল ঠাকরেকে মনে রাখে। জন্মাষ্টমীর হাণ্ডাফোড় কিম্বা গণেশমূর্তি বিসর্জনের শোভাযাত্রার সময় রাস্তার ধারে ধারে তাঁর বিশাল বিশাল ছবি টাঙিয়ে সত্র খোলে, জল-মিষ্টি বিতরণ করে। এখনো শিবসেনা যে ভোট পায় তা ওই গেরুয়া জামা, রুদ্রাক্ষের মালাপরা ছিপছিপে চেহারার মানুষটার বিরাসতের জন্য। বেশ কয়েক বছর মুম্বইয়ে থাকার সময় এই প্রতিবেদকেরও তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়েছে। বাল ঠাকরে প্রতিষ্ঠিত শিবসেনার মারাঠা জাত্যাভিমান আর বিজেপির প্রখর জাতীয়তাবাদের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছিল একটা রাজনৈতিক পরম্পরার রসায়ন। যার ফলিত প্রযোগ প্রথম দেখা গিয়েছিল মনোহররাও যোশীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত সেনা-বিজেপি জোট সরকার গঠনের মধ্যে। সেটা ছিল ওই 'কুর্সি কোনোদিন ছুঁয়েও দেখব না' শপথ নেওয়া মানুষটার বৃহত্তর স্বার্থের পরম্পরার জন্য। একটা আঞ্চলিক, আর একটা জাতীয় দলের সম্পর্কের সেই পরম্পরার মূলে আঘাত শুরু করেন বংশানুক্রমিক সূত্রে সিবসেনার কর্তৃত্ব হাতে পাওয়া উদ্ধব ঠাকরে। রাজনীতিতে যাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে 'জঙ্গল ফোটোগ্রাফি' করে বেড়াতেন। ঘুরে বেড়াতেন দুর্গে দুর্গে। বরং বালাসাহেবের রাজনৈতিক শিষ্য মনে করা হতো আজীবন অকৃতদার এবং কুর্সির মোহমুক্ত অন্য এক শিবসৈনিক আনন্দ দিঘেকে। যিনি 'আনন্দ আশ্রম' বানিয়ে চটজলদি মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে বালাসাহেবের নিকট সান্নিধ্যে এলেও আনন্দ দিঘের শিষ্য হিসেবে তাঁর বেশি পরিচিতি ছিল। ঠানে শহরের একপ্রান্তে অটোরিকশা চালানো সংগঠন কুশলী একজন শিবসৈনিক শিণ্ডে চাইলে হয়তো আরও আগেই মুখ্যমন্ত্রী কিংবা নিদেনপক্ষে উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি এতদিন বালাসাহেবের পারিবারিক উত্তরাধিকারীকে নেতা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি। তাহলে কী এমন হলো যে আজ তিনি মহা আঘাড়ি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধবের বিরুদ্ধে এতবড়ো বিদ্রোহ করলেন?

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আবির্ভূত হওয়া নরেন্দ্র মোদীর উত্থানে প্রমাদ গুনতে শুরু করেন বিজেপি বিরোধীরা। চতুর রাজনীতিক শরদ পওয়ার 'ভালো মানুষ' উদ্ধবকে দাবার বোড়ে করে পেছন থেকে শকুনির চাল চালতে শুরু করলেন। আর সেই চালে পা দিয়ে সামনে থেকে উদ্ধবকে পরামর্শ দিতে লাগলেন শিবসেনার দৈনিক মুখপত্র 'সামনা'র

সম্পাদক সঞ্জয় রাউত। আর অন্দরমহল থেকে স্বামীকে সামনে ঠেলে দিতে লাগলেন উদ্ধবপত্নী রশ্মি ঠাকরে। দলের সবাই যাকে ডাকেন 'বহিনি সাহিব' বলে। দীর্ঘদিন রাজনীতির কাছে থেকে তাঁর একমাত্র স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বামী ও ছেলে আদিত্যকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে দেখা। নিজে সামনে না এলেও শিবসেনার সকলেই জানেন যে আড়ালে থাকলেও তিনি দলের একজন বড়ো নীতি নির্ধারক। দল বহুক্ষেত্রেই তাঁর নীতি অনুসরণ করে চলে। অন্যদিকে কেবল মোদীই নয়, শরদ পওয়ারের সামনে অতি দ্রুত ছায়া বড়ো হতে লাগল বিদর্ভ এলাকার 'স্ট্রংম্যান'। তিনি সাতারার, ফড়নবিশ নাগপুরের। এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারে না। সুতরাং কৌশলী পওয়ার মনে মনে ঠিক করলেন যেভাবেই হোক বিজেপির উত্থান রোধ করতেই হবে। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ বিজেপির মতো দলের মধ্যে ভাঙন ধরানো কিংবা তাকে সামনাসামনি যুদ্ধে দুর্বল করা অনেক কঠিন। টার্গেট করলেন শিবসেনাকে। তাঁর এই কূটনীতি বোঝার ক্ষমতা উদ্ধবের ছিল না। এবার সরকার থেকে উৎখাত হওয়ার সময়ও যে হয়নি তা বোঝা যায় গত ২৪-২৫ জুন শিবসেনার প্রধান মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের কথায়। তিনি প্রকাশ্যেই বলে দিলেন, 'মহাবিকাশ আঘাড়ির নেতা শরদ পওয়ারে অপমান আমরা বরদাস্ত করব না।' আড়ালের কূটকৌশলী এবং খলনায়কদের কথায় পরে আসা যাবে। কারণ সেসব অনেক দীর্ঘ ইতিহাস। আপাতত সাম্প্রতিক ঘটনায় ফিরে আসা যাক।

একনাথ শিণ্ডেরা বরাবরই ঠাকরে পরিবারের অনুগত এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ শিবসৈনিক। মেঠো নেতা শিণ্ডে ছিলেন তাঁর নিজের মতোই। ২০১৯-এর নভেম্বরে বিজেপির সঙ্গে পরম্পরাগত জোট ছেড়ে শিবসেনা যখন এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকারে বসে তখনও তিনি তার বিরোধিতা করেননি। কিন্তু যত দিন গড়াতে লাগল দেখতে লাগলেন শরদ পওয়ার কেবল উপ মুখ্যমন্ত্রিত্ব নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকও দখল করে নিয়েছেন। এবং উদ্ধবকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসিয়ে রেখে এনসিপির অ্যাজেন্ডাগুলোকেই রূপায়িত করে যাচ্ছেন। গৈরিক বসনধারী নিরীহ সাধুদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, এনসিপি নেতা অনিল দেশমুখ দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব খুইয়েছেন, দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের অভিযোগে ধরা পড়েছেন এনসিপির নেতা নবাব মালিক। তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে আগামী নির্বাচনে মহাবিকাশ আঘাড়ি তো বটেই, শিবসেনার অস্তিত্বও থাকবে কিনা সন্দেহ। তখন থেকেই উদ্ধবকে নানা বিষয়ে সাবধান করে দিতে শুরু করলেন। এমনকী বছরখানেক আগে থেকে উষ্মা প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। কিন্তু ক্ষমতার মোহে এবং সম্ভবত অন্দরমহলের মন্ত্রণায় উদ্ধব সেসব কানেই তুললেন না। শিণ্ডের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে তারস্বরে আজান বিতর্ক, রাজ ঠাকরে এবং লোকসভা নির্দল সাংসদ নবনীত রাণার হনুমান চালিসা পাঠকে কেন্দ্র করে উদ্ধব তথা মহা আঘাড়ি সরকারের ভূমিকায়, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে বিরূপ মন্তব্যে, স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের অপমানকে গায়ে না মাখার মতো হিন্দুত্ব বিরোধী সেকুলার নীতিতে। যে বালাসাহেব হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, লাউড স্পিকারে আজান বন্ধ না হলে শিবসেনা সমস্ত মসজিদ থেকে জোর করে মাইক নামিয়ে দেবে, তাঁর আদর্শে কট্টর হিন্দুত্ববাদী শিষ্য শিণ্ডে দেখলেন সঞ্জয় রাউত প্রকাশ্যে বলছেন মহারাষ্ট্রে একটাও বেআইনি লাউড স্পিকার নেই। শিবসেনার পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে। উদ্ধবকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন পওয়ারের খপ্পর থেকে বেরিয়ে বিজেপির সঙ্গে জোট সরকার করার জন্য। কিন্তু উদ্ধব সব শুনেও ধৃতরাষ্ট্রের মতো চুপ করে রইলেন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি মহা আঘাড়ি ছাড়বেন না।

এর পরের ঘটনা ২০ জুন । মাঝরাতে উদ্ধব হঠাৎ করেই জানতে পারলেন তাঁর দলের বেশিরভাগ বিধায়কের সঙ্গে দলনেতৃত্বের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁরা রাতারাতি কর্পূরের মতো কোথায় উবে গেছেন জানতে সময় লাগল আরও কয়েক ঘণ্টা। শিণ্ডেই মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে জানালেন যে মহা আঘাড়ির সঙ্গে তাঁরা নেই। দলবদ্ধ ও ঐক্যভাবে তারা রয়েছেন গুজরাটের একটা হোটেলে। কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়েছে জেনে উদ্ধব মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে চাইলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাঁর পরামর্শে চলচিলেন সেই শরদ পওয়ার তাকে তা করতে দিলেন না। তখন উদ্ধব যদি তা করতেন তাহলে তার মান রক্ষা হতো। মাতোশ্রীতে বসে টিভির পর্দায় দেখতে হতো না তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটার দৃশ্য। আসলে উদ্ধব তো বটেই, শরদ পওয়ারও এমন ঘটনা যে ঘটবে বুঝতে পারেননি। পওয়ার নিজেও তা স্বীকার করেছেন। সেটা তাঁর কৌশল হতে পারে। বাল ঠাকরে তার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, শিবসেনার কর্তৃত্ব ঠাকরে পরিবারের হাত থেকে ছিন্ন করে তার বদলা নিলেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে, বাইরে যা ঘটল তা হলো বিধানসভায় ১৬৪-১০৭ ভোটের ফয়সালায় স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক রাহুল নার্বেকর। পরদিন ৪ জুলাই ১৬৪-৯৯ ভোটে আস্থা লাভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। মহারাষ্ট্রে ফিরে এসেছে বিজেপি- শিবসেনা জোট সরকার।

অতঃপর শিবসেনার কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত কার হাতে থাকবে তা নির্ধারিত হবে আইনি প্রক্রিয়ায়। শিণ্ডে গোষ্ঠীর হাতে বালা সাহেবের তির-ধনুক থাকবে কিনা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। নির্বাচন কমিশন ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। আরও বেশি নজর রাখার দিকটা হলো, ক্ষমতা দখলের কুরুক্ষেত্র আপাতত শেষ হলেও খলনায়করা আড়ালে থেকে গেছে। তবে এখন যেটা বাস্তব তা হলো মহারাষ্ট্রে আড়াই বছর আগে যে পরম্পরার অপমৃত্যু ঘটেছিল, এতদিন পরে সেই পরম্পরা পুনর্জীবিত হয়েছে। আবার শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে বিজেপির জোট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। পেছনের ইতিহাস এবং সামনের ঘটনা নিয়ে আর এক সময় আলোচনা করা যাবে। □

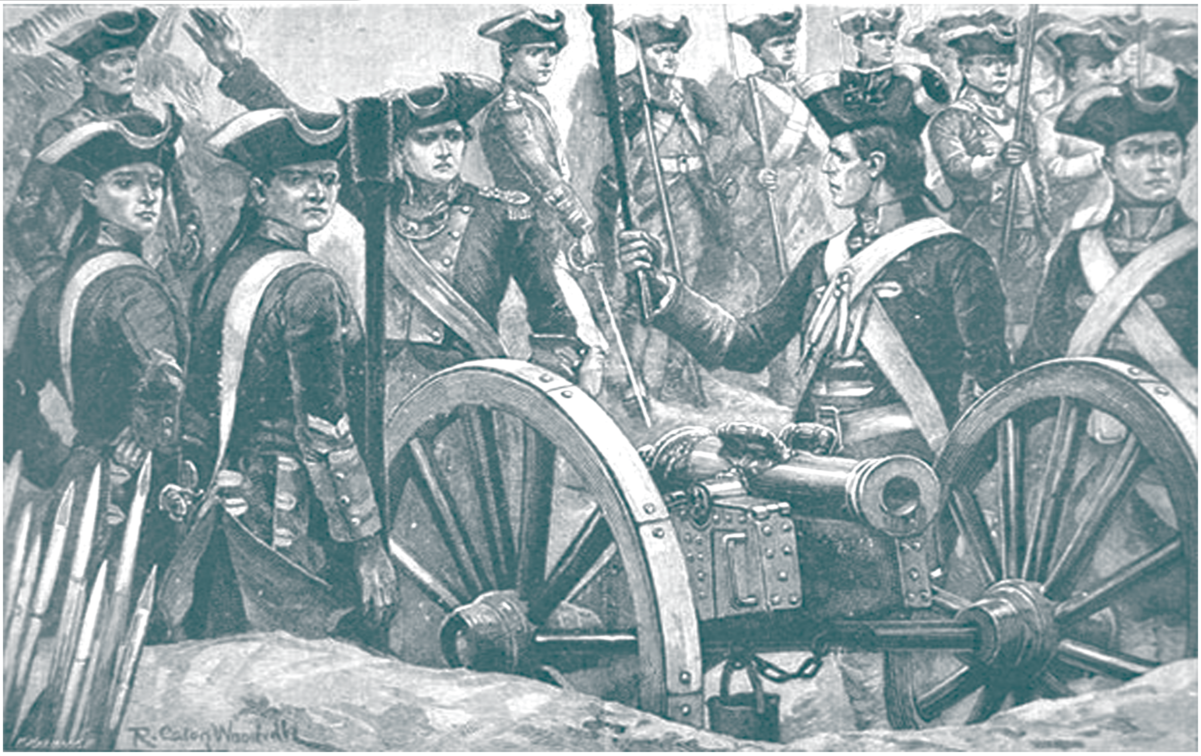

সিরাজের পরাজয় বাঙ্গালির পরাজয় নয়

কুশল বরণ চক্রবর্তী

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাঙ্গালির পরাজয় নয়। সিরাজউদ্দৌলার মাতৃভাষা ছিল ফার্সি। তাইতো সিরাজউদ্দৌলাকে যখন ইংরেজ সেনা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তার দু'পাশের অসংখ্য কৃষক নিশ্চিন্তমনে জমি চাষ করছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুশিতে হাত তালিও দিচ্ছিলেন। তাদের কাছে এ যুদ্ধ ছিল দুই সাম্রাজ্যবাদীর লড়াই। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া তাঁর 'মৃদুভাষণ' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে। শাহ এএমএস কিবরিয়া লিখেছেন : '২৬ মার্চ যখন ফিরে আসে তখন কবিগুরুর অনুপম চরণগুলো হৃদয়-মনকে উতলা করে তোলে। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসে গর্ব করার মতো কী আছে তা নিয়ে অনেকেই লেখালেখি করেছেন। আমি এসব অতীত কাহিনি পড়ে তেমন উজ্জীবিত হই না। পাঠান আমলে বাংলাদেশে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এও সত্য যে, তৎকালীন পাঠানরা কোনো বিচারেই বাঙ্গালি ছিলেন না। বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল বলে আমি মনে করি। রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাঁরা স্থানীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা বাংলায় কথাও বলতেন না এবং আচার আচরণে খাঁটি বাঙ্গালি সমাজের কাছাকাছিও ছিলেন না। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার করুণ পরিণতির কাহিনি পড়ে আমরা বেদনা অনুভব করি, কিন্তু কেউ কি দাবি করবেন যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালি ছিলেন? ইতিহাসে পড়েছি নবাব আলীবর্দী খান ইরান দেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর দৌহিত্র সর্বাংশেই একজন ইরানী ছিলেন। হয়তো সে কারণেই আমরা দেখি, যখন পলাশীর আম্রকাননে লড়াই হচ্ছে তখন, তার পাশেই, শস্যক্ষেত্রে বাঙ্গালি কৃষকরা নির্বিকারভাবে কৃষিকর্ম করে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল দুই বিদেশি শক্তির মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল অনুপস্থিত।' (শাহ এ এম এস কিবরিয়া ১৯৯৭ : ৫)

মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে মাত্র একবছর দু'মাসের মতো শাসন ক্ষমতা ছিল। তিনি ১৭৫৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের কিঞ্চিদধিক এক বছর শাসন করেন। অথচ আমরা আমাদের বাল্যকাল থেকে পাঠপুস্তক-সহ প্রত্যেকটি স্থানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রসঙ্গে যে আলোচনা শুনেছি, তাতে আমার ধারণা ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা বহুদিন বাঙ্গলার শাসক ছিলেন। পরে ধীর ধীরে জানতে পারলাম তিনি মাত্র একবছরের মতো বাঙ্গলার শাসক ছিলেন। প্রথম এ বিষয়টি জেনে আমি আশাহত হই। পরবর্তীতে তার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে গিয়ে আরও নতুনভাবে অনেক তথ্য জানলাম। যে সকল তথ্যের অধিকাংশই আগে জানা ছিল না।

নবাব সিরজউদ্দৌলাকে নিয়ে বিভিন্ন মিথ বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে, যার অধিকাংশই সত্য নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই তৈরি করে ইতিহাসের নামে চালানো হয়েছে। যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে বিভিন্ন মিথের পিছনে দুটি কারণ। প্রথমত, ধর্মগত সাদৃশ্যের কারণে, তার পূর্বপুরুষ তুর্কি থেকে আগত হলেও তাকে অনেক বাঙ্গালি স্বদেশীয় প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তাদের অন্যতম যুক্তি হলো বাঙ্গলায় বা ভারতবর্ষে তুর্কি, পাঠান প্রভৃতি শাসকেরা বিদেশি বংশোদ্ভূত হলেও, তারা যেহেতু এদেশে বসবাস করত তাই তারা এদেশীয় হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গৌরবান্বিত করার বিবিধ প্রচেষ্টা শুরু করে। সেই লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন সাহিত্য রচনা করেন। ব্রিটিশেরা যেহেতু নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে ধীরে ধীরে বাঙ্গলার শাসনভার নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে, তাই তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী নবাব সিরাজউদ্দৌলা-সহ অন্যান্য শাসকদের মহিমান্বিত করতে শুরু করে।

সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালি ছিলেন না, তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতেন কিনা সে বিষয়টিও সুনিশ্চিত নয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সম্পূর্ণ নাম ছিল মির্জা মুহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা। তিনি ছিলেন আলিবর্দি খানের দৌহিত্র এবং জৈনুদ্দিন আহমদ খান ও আমিনা বেগমের পুত্র। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তুর্কি জাতির বংশধর ছিলেন। আলিবর্দি খানের প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তার বাবার নাম ছিল মির্জা মুহম্মদ মাদানি। তুর্কি বংশোদ্ভূত মির্জা মুহম্মদ মাদানি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজম শাহের দরবারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার দাদু আলিবর্দি খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। শুধুই তিন কন্যাসন্তান ছিল। তিনি তার কন্যাদের বড়োভাই হাজি আহমদের তিন

ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা দাদু আলিবর্দি বা ঠাকুরর্দা হাজি আহমেদের বাবা মির্জা মুহম্মদ মাদানি ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। তাই পিতৃপুরুষের পরিচয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলা আদতে তুর্কি বংশোদ্ভূত, কোনোমতেই বাঙ্গালি নয়।

আরেকটি বিষয় প্রতিনিয়ত বলা হয় যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব। তথ্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও, সঠিক নয়। প্রকৃত তথ্য হলো তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ মুঘল শাসনের অধীনে ছিল। তাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোনো স্বাধীন শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মুঘল সম্রাটের পক্ষে বাঙ্গলার আঞ্চলিক প্রতিনিধি। এককথায় বলতে গেলে, তিনি স্বাধীন ছিলেন না, তিনি ছিলেন সম্রাটের অধীনস্থ বাঙ্গলার নবাব। অনেকটা বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ মুখ্যমন্ত্রীর মতো। নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাসকারগণ যে সকল তথ্য দিয়েছেন, সেই তথ্যানুযায়ী তাকে সচ্চরিত্রের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। মাতামহ আলিবর্দি খানের মৃত্যুশয্যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কোরান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে, তিনি মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকবেন। নিয়মিত মদ্যপান তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তিনি মদ্যপান থেকে পরবর্তীতে বিরত ছিলেন কিনা এ নিয়ে ইতিহাসকারগণ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'-তে 'সিরাজউদ্দৌলা' প্রবন্ধে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি সম্ভবত সত্য যে, নওয়াব হিসেবে সিরাজ ছিলেন খানিকটা উদ্ধত এবং খুব সম্ভবত কিছুটা অসহিষ্ণু। এক কথায় তিনি সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। অস্থির চিত্তের সিরাজের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব ছিল। এছাড়া সংকটকালে সিদ্ধান্তহীনতাও তাঁর অন্যতম ত্রুটি। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, সিরাজ তখন ছিলেন মাত্র চব্বিশ বছরের এক অপরিণত ও উদ্ধত যুবক। ক্ষমতা ও উচ্চাসন তাঁকে কিছুটা বেপরোয়াও করে তুলেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল এই যে, অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি তাঁর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারে সেরূপ কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। এরূপ সাবধানতা অবলম্বনে তাঁর ব্যর্থতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার মতো মানসিক দৃঢ়তার অভাবের কারণেই তাঁর পতন হয়।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় কারও সম্পর্কে খুব একটা নেতিবাচক মন্তব্য চোখে পড়ে না। কিন্তু তিনি তাঁর 'বাঙ্গলার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থে নবাব সিরাজউদ্দৌলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্বোধ, নৃশংস ও অবিমৃশ্যকারী, কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক মানুষের সঙ্গী, নারীর সতীত্ব লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে সিরাজউদ্দৌলা কোনো সুশাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নিয়ন্ত্রণহীন এক তরুণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কাছে পরাজয় না হলেও তার নবাবি দিল্লির মুঘল সম্রাটেরা এমনিতেই কেড়ে নিতেন। কারণ সওকতজঙ্গের বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদান-সহ সুবাদারির প্রার্থনায় দিল্লির মুঘল সম্রাট এক প্রকার সম্মত হয়ে গিয়েছিলেন।

''সওকতজঙ্গ সিরাজউদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্বোধ, নৃশংস ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন; সুতরাং অধিককাল, তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীতি ও ঐক্যবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরান কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ওই সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে প্রায় কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপাতত সওকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন; কিন্তু মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাতত এই উপায় দ্বারা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পরে কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সওকতজঙ্গের সুবাদারির সনন্দ প্রার্থনায় দিল্লিতে দূত প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।'' (বিদ্যাসাগর ২০০২ : ১১১৯)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথার সত্যতা পাওয়া যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ইউসুফ আলি খানের বিবরণে। তার রচিত 'তারিখ-ই-মহব্বত জঙ্গী' গ্রন্থে তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বলেছেন, 'সিরাজ-উদ-দৌলা এই পৃথিবীর রাজত্বে তৃপ্ত ছিলেন না এবং (কোনো কিছুতেই তিনি) সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর অত্যধিক অত্যাচারের মাত্রা, অত্যধিক রক্তপিপাসুতা ও সীমাহীন গালিগালাজপ্রিয়তা এই দেশের সব সিংহের পিত্তকে পানিতে পরিণত করতে পারত। আজ তাঁর মাথার উপরে ছিল একটি টুপি, (পরিধানে) ছিল পায়জামা এবং কাঁধে ছিল একটি কম্বল। সেই অবস্থায় পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি এই ধরণীর একটি ক্ষুদ্র কোণ মাত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁর এই বিধ্বস্ত দেহ বিরাট বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণের সুযোগ আর পাননি এবং মহা প্রতিশোধ গ্রহণকারী বিচারকের আদেশে মৃত্যুর তরবারি তাঁর সব আকাঙ্ক্ষার শিকল ছিন্ন করে দেয়। মীর মোহাম্মদ জাফর খান বাহাদুরের আদেশে তাঁকে মহাবত জঙের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। এই ঘটনা এগারোশো একাত্তর হিজরী সনের ১৫ সওয়াল তারিখে ঘটে। তাঁর রাজত্বকাল দুর্যোগপূর্ণ হলেও এক বছর তিন মাস ছিল।' (আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া ১৯৯৭ : ১৯০-৯১)

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ইউসুফ আলি খানের বিবরণে 'তারিখ-ই-বাঙ্গলা-ই-মহব্বত জঙ্গী' গ্রন্থের মতো নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু এবং পরবর্তীতে মৃতদেহের বিবরণ 'মোজাফফরনামা' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। মোজাফফরনামা গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন করম আলি খান। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহকে কী পরিমাণে অমর্যাদা করা হয়েছিল সে বিবরণ করম আলি খানের মোজাফফরনামায় পাওয়া যায় : 'সিরাজের দেহে বিশটি আঘাত করেও কাজ শেষ করতে না পেরে মোহাম্মদী বেগ তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন মুঘলকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করে এবং সে ব্যক্তি ছোরার এক আঘাতেই সিরাজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। তাঁর দেহ একটি হস্তীর পৃষ্ঠে স্থাপন করে সীমাহীন অমর্যাদার সঙ্গে সমগ্র নগরে ঘোরানো হয়। সেই হস্তী সিরাজের জননীর বাসভবনের সামনে আসলে তিনি খালি পায়ে ও খালি মাথায় দৌড়িয়ে এসে হস্তীর পায়ের কাছে নিজেকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু খাদিম হোসেন খানের লোকজন তাঁকে বলপ্রয়োগ করে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। (সিরাজের মৃতদেহ নিয়ে) খাদিম হোসেন খানের বালাখানার সামনে উপস্থিত হলে তিনি নির্লজ্জ হয়ে মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য একখানা বস্ত্র মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করেন।

অবশেষে সিরাজের মৃতদেহ বাজারের চত্বরে নিক্ষেপ করা হলে কেউ তা দাফন করতে সম্মত হয়নি। এই পরিবারের ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে এবং নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে মীর্জা জয়নুল আবেদীন বাকাওয়াল মৃতদেহকে গোসল করান এবং একটি কফিনে ভরে তা আলিবর্দীর কবরের পাশে সমাধিস্থ করেন। সিরাজের রাজত্বকাল পনেরো মাস স্থায়ী হয়।' (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ১৯৯৮ : ১২৮)

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজয়ে বাঙ্গালির পরাজয় মোটেও হয়নি। মাঝেমধ্যে দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙ্গালি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে একপ্রকার পরাধীনই ছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জন প্রভু বদল হয়েছিল মাত্র। এদেশীয় ক্ষমতা এক সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে গিয়েছিল মাত্র। তুর্কিদের হাত থেকে কিছুটা সভ্য এবং কিছুটা মানবিক ব্রিটিশদের হাতে।

তথ্যসূত্র :

১. আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত), ইউসুফ আলি খান, তারিখ-ই-বাঙ্গলা-ই-মহব্বত জঙ্গী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৭।

২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত), মোজাফফরনামা ও নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খান, ঢাকা : বাংলা একডেমী, মার্চ ১৯৯৮।

৩. তীর্থপতি দত্ত (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : তুলি-কলম, মার্চ ২০০২।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

৫. শাহ এ এম এস কিবরিয়া, মৃদুভাষণ, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭।

৬. সিরাজউদ্দৌলা, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫।

(লেখক সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

অগ্নিপথে অগ্নিবীণা কে বাজায়?

অগ্নিপথে অগ্নিবীণা বাজাবেন এখন জওয়ানরা— এটা এখন সামরিক বাহিনীতে জওয়ান পদে যোগদানের নতুন প্রবেশ পথ। বর্তমান কী নিষ্ঠুর? তাই আমরা বর্তমান ফেলে ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন। অতীতের শূন্যতার মতো ভবিষ্যৎ কেবল কল্পনা মাত্র, এটা আমরা কখনো চিন্তা করতে পারি না। তাই আমরা বর্তমান জওয়ান পদে যোগ না দিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তায় ছুটে মরেছি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন— 'বর্তমানের কবি ভাই আমি, ভবিষ্যতের নই নবী।' দেশে এখন সোনালি স্বপ্নের হাতছানি। অগ্নিপথে অগ্নিবীণা বাজাবেন এখন নবীন জওয়ানরা। সামরিক বাহিনীতে ৪০ হাজার জওয়ান নিয়োগ হতে চলেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স হবে ১৭ থেকে ২১ বছর। চাকুরির সময়সীমা ৪ বছর। সামরিক বাহিনীর একটা প্রশিক্ষণ হবে ৬ মাসের। মাইনে প্রথমে ৩০ হাজার, পরে হবে ৪০ হাজার টাকা। তারা স্থল, জল, বায়ু সেনাতে কাজ করবেন। কর্মরত অবস্থায় কোনো জওয়ান মারা গেলে তাঁর পরিবার পাবেন ১ কোটি টাকা। ৪ বছর পর ওই জওয়ান পদ থেকে ২৫ শতাংশ আবার স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাবেন। চাকুরির সময়সীমা আরও ৯ বছর বেড়ে যাবে। তারা হবেন অগ্নিবীর। অগ্নিবীরদেরও শৌর্য পুরস্কার প্রদান করা হবে।

যারা ৪ বছর পর ওই জওয়ান পদ থেকে চলে আসবেন, যারা অগ্নিবীর হতে পারবেন না, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? সরকার বিরোধী দলনেতাদের এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বিরোধী দলনেতারা সহজ উত্তরের কঠিন প্রশ্ন করেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাই তারা ট্রেন, বাস, পোস্ট অফিস পোড়ান, পাথর ছোড়েন। আন্দোলনের নামে জঙ্গি কার্যকলাপে প্রশ্রয় দেন যা একান্তভাবে কাম্য নয়, অনভিপ্রেত। অগণতান্ত্রিক আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে? কর্মে যোগদানের সব পথ সব সময় খোলা আছে। কর্মের বিকল্প পথ বাছা যেতেই পারে কিন্তু পাথর ছোড়া থেকে বিরত থাকুন। পাথর ছুড়ে কেসের আসামি হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না।

যাঁরা জওয়ান পদ থেকে ফিরে আসবেন, সঙ্গে নিয়ে আসবেন কঠিন, ভয়ংকর, বিচিত্র, সুন্দর অভিজ্ঞতা। তাঁরা পাবেন সামরিক বাহিনীর একটা সার্টিফিকেট। পাবেন ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। ওই টাকার উপর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। বেকারত্বের দেশে বেকারত্বের জ্বালামুক্ত ২৫ বছর বয়সি এক তরতাজা যুবকের সামনে বিস্তৃর্ণ কর্মের আহ্বান। আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনায় তারা ভরপুর। তারা আমাদের সোনালি স্বপ্নের ভবিষ্যৎ, দেশ গড়ার কারিগর।

কিন্তু নেতারা শুধু তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নবীন জওয়ানদের ভবিষ্যৎ আগুনে পোড়াচ্ছেন। তারা বসে গিয়েছেন যুবকদের ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে। ওরা ট্রেনে, বাসে আগুন ধরাচ্ছেন। পাথর ছুড়ছেন। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছেন। তারা শুধু জওয়ানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই পোড়াচ্ছেন না, তারা কর্মনাশা পরিস্থিতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, কর্ম ধ্বংস করে কর্মহীন দেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাই কারোর প্ররোচনায় পা না দিয়ে কোনো প্রলোভনের ফাঁদে না পড়ে শুধু নিজেদের কথা ভেবে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে অগ্নিবীণা বাজাতে বাজাতে অগ্নিপথে যোগ দিন। নিজে বাঁচুন, দেশকে বাঁচান। সুখে থাকুন।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

ইউনিকর্ন একশৃঙ্গ অশ্ব বা ষাঁড় কী বলছে?

সিন্ধু সভ্যতার এক জটিল রহস্য তার ইউনিকর্ন বা একশৃঙ্গ অশ্ব বা ষাঁড়। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়া প্রধানত চৌকো সিলগুলিতে। খোদাই করা হয়েছে অনেক জন্তুজানোয়ারের মূর্তি। আশ্চর্যের এই যে অন্য সকল জন্তুই বাস্তবের হলেও সেখানে রয়েছে এক কাল্পনিক জীব, ইউনিকর্ন। রূপকথার একশৃঙ্গ ঘোড়ার মতো জন্তু। ইউনিকর্ন যে সিন্ধু রহস্যকে প্রবলতর করে তুলেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে মোট পাওয়া সিলের প্রায় তিন- চতুর্থাংশতেই এই ইউনিকর্ন।

যাই হোক, এখন মূল বিষয়ে আসা যাক। ইউনিকর্ন যে এক বিস্ময়কর কাল্পনিক বিষয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমরা যদি একশৃঙ্গ অশ্ব বা প্রাণীর ছবি লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পারবো, প্রাণীর শরীরের সম্মুখের অংশ অশ্বের আর পিছনের অংশ ষাঁড়ের। উল্লেখ্য, অশ্বের মাথায় কৃত্রিম শৃঙ্গ পরানো রয়েছে। এখানে অশ্ব হচ্ছে গতি ও শক্তির প্রতীক আর ষাঁড় হচ্ছে প্রজননের প্রতীক। প্রজননের অর্থ সন্তান জন্মানো বা বংশ বৃদ্ধি বোঝায়। মানব সন্তান ছাড়া গবাদি প্রাণীও বোঝানো যেতে পারে। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অশ্বের মাথায় শৃঙ্গ পরানো হলো কেন? অশ্বকে আরও শক্তিশালী বা সুন্দর দেখাবার জন্য শৃঙ্গ পরানো হতে পারে। পরিশেষে বলতে হয়, হরপ্পার মানুষ শক্তি ও বংশবৃদ্ধি কামনা করত। সিন্ধু সভ্যতায় অশ্ব আর ষাঁড় ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। মনে একটা প্রশ্ন জাগে, সিন্ধু সভ্যতা কি বৈদিক সভ্যতার অংশ?

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

ধর্মহীন রাজনীতি

ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা সকলেরই কর্তব্য। আমরা তা করি কোথায়? বামপন্থীরা বার বার 'ধর্ম ও রাজনীতি' নিয়ে কতো প্রশ্ন তুলেছে। কতো বড়ো বড়ো সেমিনার করেছে। অবশ্য তখন তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিল। বিজেপি জানে যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ধর্মহীন রাজনীতি করার ফল আমাদের আজ চোখের সামনে। ধর্ম আমাদের শেখায় নিজের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে। ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় পক্ষপাতশূন্য আচরণ করতে। ধর্মহীন রাজনীতি করে আমরা কী পেলাম? একজনকে বঞ্চিত করে অন্য জনকে অন্যায়

ভাবে ঘুস নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়ার পরেও রাজ্যের এক মন্ত্রী অবৈধ উপায়ে তার মেয়েকে শিক্ষিকা পদে নিয়োগ করেছে। পুলিশ পক্ষপাত আচরণ করায় কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশ ও সিআইডির উপর ভরসা হারিয়ে তদন্তভার সিবিআইকে দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিলে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে বলেন, 'এই তোরা গালাগাল দিচ্ছিস কেন?' জয় শ্রীরাম ধ্বনি কি গালাগাল? ভগবান শ্রীরাম কোটি কোটি হিন্দুর উপাস্য দেবতা। সেদিন কি হিন্দু সমাজের মনোকষ্ট হয়নি? হিন্দুরা সহিষ্ণু। তাই তারা রাস্তায় নামেনি। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে ফাঁসি চাই দাবি করেনি। কেন জানেন? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে মহিলার সম্মান আগে। তাই কষ্ট হলেও মুখ বুজে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। তবু লজ্জা লাগে যখন কোনো মহিলা শিবকে নিয়ে অপশব্দ প্রয়োগ করে তার দলে উচ্চ পদে আসীন হয়।

বিজেপি দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে মহিলাদের সম্মান করার শিক্ষা পেয়েছে। কমিউনিস্টদের মতো মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ভাবে না। আশা করবো আজকের বামপন্থী বা সেকুলারপন্থীরা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কেন তারা বা তাদের বাপ-ঠাকুরদাদা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে এসেছেন? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের এই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন? বামপন্থী ও সেকুলারবাদীদের অনুরোধ করছি, দয়া করে শুধু রাজনৈতিক লাভের জন্য বাঘের পিঠে চড়ার সাহস দেখাবেন না।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

নূপুর শর্মা কী অপরাধ করেছেন?

সম্প্রতি নূপুর শর্মার একটি মন্তব্যকে নিয়ে এক সম্প্রদায়ের জনগণ উত্তেজনায় সারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, অন্যের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে, দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করছে অথচ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন মনে করছে না। রহস্যটা কী? অন্যদিকে দেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতি নূপুর শর্মাকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কেন? রহস্যটা কী? পয়গম্বরের যে বিষয়টি নিয়ে এত উত্তেজনা এত বিতর্ক, বিভ্রান্তি সেটি তো ইসলামের ধর্মগ্রন্থ হাদিসেই নাকি রয়েছে। এই মুহূর্তে হাদিস আমার সংগ্রহে নেই, তবে অন্য পুস্তকে রয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন, পয়গম্বর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা কি ইসলামে নিষিদ্ধ, সত্য মিথ্যা যাই হোক? এদিকে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে প্রতিমা ভাঙা, মন্দির কলুষিত করা, দেবোত্তর সম্পত্তি বেআইনিভাবে জবরদখল করা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। এসব নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। হিন্দু কন্যা অপহরণ, ধর্মান্তরকরণ এবং নিকাহ নিয়মিতভাবে হয়েই চলেছে, বাংলাদেশে তো বটেই এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও। এসব কিছু নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ২০২১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা করা হয়েছিল ১৫২ জন। প্রতিমা ভাঙা হয়েছিল ২১৩০টি। হিন্দু কন্যা অপহৃতা হয়েছিল ১৫১ জন। এসব নিয়ে বাংলাদেশে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গেও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা নূপুর শর্মার করা পয়গম্বরের বিষয়ে মন্তব্যের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এক ধ্বজাধারীদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষরা অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের পিতৃপুরুষের বাসভবন থেকে উৎখাত হয়ে রাতের অন্ধকারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একবস্ত্রে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। এদের পরবর্তী প্রজন্ম বিভিন্ন মিটিঙে মিছিলে স্লোগান দিত 'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' আর গান ধরে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।' তাহলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা রাতের অন্ধকারে একবস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে নেই। তবে পয়গম্বর সম্পর্কে একটি মন্তব্যের বিষয়ে নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে সবাই সোচ্চার। কী বিচিত্র এই দেশ!

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ

৪ জুলাই স্বস্তিকা পত্রিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনেকের কাছেই ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের কর্মধারা অজানা। তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি। বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সন্তান শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকে যাতে জনগণ না জানতে পারে তার জন্য তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকে এককথায় মুছে দেওয়া হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব ও ভারতমাতার পূজারি তাঁকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনগণের মন থেকে তাঁদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জানতে দেয়নি।

ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী রূপে কিছু রাজনৈতিক দল তাদের নিজ স্বার্থের জন্য এইরকম ভাষায় ভারতের জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন। শ্যামাপ্রসাদের আত্মত্যাগ, অসীম সাহস, অদম্য মানসিকতার জন্য ভারতের জনগণ তাঁকে শ্রেষ্ঠ ও মহান পুরুষের আসনে বসিয়েছেন। হিন্দু ধর্ম কী? ও তার উদ্দেশ্য কী? এই মহান ও সহিষ্ণু হিন্দু ধর্মকে ভারতের কোণায় কোণায় তিনি প্রচার করেছিলেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারতের এই সুসন্তান অক্লান্ত পরিশ্রম করে সার্বভৌম ও অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ভারতমাতার একজন বিপ্লবী সন্তান। তাঁর মৃত্যুও সাধারণ মৃত্যু নয়, তাঁর মৃত্যু ছিল বীর বিপ্লবীর মৃত্যু। আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যু দেশের সেবায় আত্মবলিদান।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য

সুতপা বসাক ভড়

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে আমরা ভারতের মাতৃশক্তির জন্য গর্ববোধ করি। আমাদের নাগরিকদের মধ্যে অর্ধেক হলেন মাতৃশক্তি। সেই মাতৃশক্তিকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তব্যে সদা তৎপর থাকতে দেখতে পাই। আমরা দেখে এসেছি যে, সেনাবাহিনীতে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা এবং কার্যপদ্ধতির জন্য সাধারণত পুরুষরাই সেখানে কার্যরত থাকেন। যদিও আমাদের দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজে নারী বাহিনী ছিল। তবে বর্তমানেও সাহস, শৌর্য ও জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনটি দলে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অস্তিত্ব থাকবে, এমন ধারণা অতীতে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে হলেও সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগেই মাতৃশক্তির অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমন কোনো কাজ নেই, যা মহিলারা করতে পারেন না, তা সেনাবাহিনীর মহিলারা পুনরায় প্রমাণ করেছেন। এঁরা নিজেদের দুর্দান্ত সাহসিকতার প্রদর্শন করে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা কোনো অংশে কারোর থেকে কম নন।

এই বছর স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে আয়োজিত সমারোহতে বিভিন্ন ট্যাবলো থেকে আরম্ভ করে ৯০ মিনিটের প্যারেড পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে মাতৃশক্তির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রক্ষামন্ত্রী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দেশের শক্তি ও সংস্কৃতির পরিচায়ক প্যারেড প্রস্তুত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নৌসেনা, বায়ুসেনা ও স্থলসেনার মহিলা আধিকারিকরা জাতীয় পতাকাকে স্যালুট জানান। সেদিন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, আমাদের নারীজাতির মধ্যেও মাতৃভূমির জন্য কিছু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিবাঙ্গী সিংহ : সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন বায়ুসেনার রাফায়েল ফাইটার জেট ওড়ানো দেশের প্রথম মহিলা পাইলট লেফট্যন্যান্ট শিবাংগী সিং বায়ুসেনার রথের নেতৃত্ব করেন। শিবাঙ্গী সিংহের বাবার নাম কুমারেশ্বর সিংহ। মার নাম শ্রীমতী সীমা সিংহ। দুই ভাই ময়ঙ্ক ও শুভাংশু। আর এক বোনের নাম হিমাঙ্গী সিংহ। শিবাঙ্গীর বাড়ি বারাণসীতে। বি.এচ.ইউ থেকে ২ ডিসেম্বর ২০১৯-এ শিবাংগী কমিশনড অফিসার নৌসেনাতে পাইলট রূপে যোগদান করেন। তিনি বি.এচ.ইউ-তে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে সপ্তম এয়ার স্কোয়াড্রনের অংশ ছিলেন। ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বি.এচ.ইউ-তে এনসিসি ক্যাডেট ছিলেন। ২০১৩-তে দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজস্থানের ফরোয়ার্ড ফাইটারেও কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্ধমানের সঙ্গে এয়ারক্রাফট চালানোয় অংশগ্রহণ করেন।

মনীষা বোহরা : সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে আর্মি অর্ডিন্যান্স কোরে লেফট্ন্যান্ট মনীষা বোহরা পুরুষ দলের নেতৃত্ব করেন। মনীষার ঠাকুরদা ও বাবা দুজনেই সুবেদার রূপে সেনা থেকে অবসর নিয়েছেন। মনীষাকে নিয়ে তাঁর পরিবার তৃতীয় প্রজন্ম ধরে দেশ

সেবা করে চলেছে। এসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওটিএ চেন্নাইতে প্রশিক্ষণ নেন। লেফট্ন্যান্ট মনীষা বোহরা অল মেল আর্মি অর্ডিনেন্স রেজিমেন্টকে নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম মহিলা। এর আগে সেনাদিবস (১৫ জানুয়ারি ২০২২)-এ পুরুষ সেনা আয়ুধ কোর রেজিমেন্টকে প্রথম মহিলা আধিকারিরূপে নেতৃত্ব দেন। তাঁর বাড়ি উত্তরাখণ্ডে। চম্পবতের খুনাবোরা গ্রামে। সিকান্দ্রাবাদের আর্মি স্কুলে পড়াশোনা করেন। এরপর তেলেঙ্গানার ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের পড়াশোনা করেন।

প্রীতি চৌধরী : প্রীতি চৌধরী ১৪০ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট থেকে সেনাতে একমাত্র মহিলা কমান্ডর। প্রীতির মায়ের নাম শ্রীমতী সুনীতা দেবী, তিনি একজন গৃহিণী। বাবার নাম ইন্দ্র সিংহ (ভারতীয় সেনাতে সুবেদার)। প্রীতির বাড়ি হরিয়ানা, পানিপথের বিঝৌল গ্রামে।

প্রীতি এনসিসি এয়ার উইং-এর হরিয়ানা গ্রুপের

জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রান্স-এ সেরা ৫ জন ক্যাডেটরূপে নির্বাচিত এবং প্রধানমন্ত্রী দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

এছাড়াও ওইদিন সশস্ত্র সীমাবলের দুজন মহিলা ট্যাবলোর নেতৃত্ব দেন। আবার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' বলতে বলতে মহিলারা বাইক চালনা করেন। সীমা সুরক্ষা বলয়ের সীমাভবানী মোটর সাইকেল দলের নেতৃত্ব দেন। সীমাভবানী দলের প্রতিনিধিত্ব করেন কনস্টেবল পুষ্পা যাদব ও রাজবিন্দর কৌর।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরাঙ্গনাদের উজ্জ্বল, গরিমাময় ও সাহসিকতা কাজের জন্য তাঁদের প্রতি রইল অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

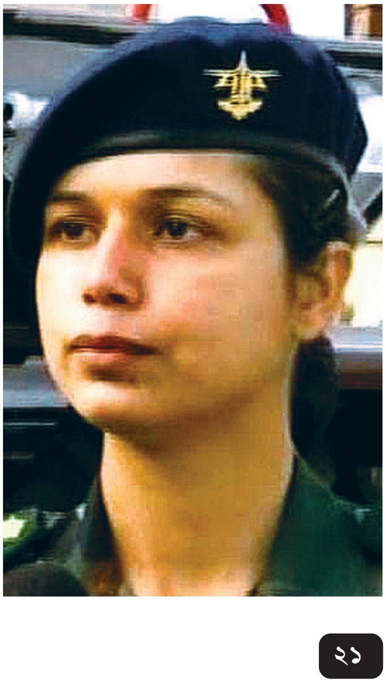

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসায় জীবনহানির আশঙ্কা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা হলো এক ধরনের বিরল ইটিং ডিজঅর্ডার। সঠিক সময়ে রোগটি ধরা পড়ে চিকিৎসা না হলে সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত হতে পারে। এই রোগে আক্রান্তদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়ামের অভাবে শরীর ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এবং শুধু কম খাওয়া নয়, রোগা হওয়া ও শারীরিক গঠন নিয়ে এরা এতটাই চিন্তিত থাকে, যে কম খেয়ে প্রচুর এক্সারসাইজ করতে থাকে দ্রুত ওজন কমানোর জন্য। কিশোরী বয়সের মেয়েদের মধ্যে এই রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এতে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে পরিবর্তনে বাধা আসে।

কারণ : অ্যানোরেক্সিয়া কেন হয় তার কয়েকটি কারণকে গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় শরীরে কিছু জিনের রদবদল। কারও যদি আত্মবিশ্বাস কম থাকে, অবসাদ, অতিরিক্ত রাগ, হতাশা, একাকিত্ব, সবসময়ে দুশ্চিন্তায় মানে মানসিক কারণে হতে পারে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা। সামাজিক কারণেও হতে পারে এই রোগ। যেমন বিশেষ কোনো কারণে মূলত পড়াশোনা বা বিয়ে নিয়ে বাড়ির থেকে ক্রমাগত চাপ। এছাড়া কেউ কিশোরী বয়সে নিজেকে রোগা দেখানোর জন্য এতটাই মত্ত হয়ে যায় যে-কোনো উপায়ে কম খেয়ে রোগা হতে থাকে। এদের সিংহভাগই অ্যানেরেক্সিয়া নার্ভোসার রোগী।

লক্ষণ : অ্যানেরেক্সিয়ার রোগীদের বিশেষ কয়েকটি উপসর্গ থাকে, যেমন শরীরের বডি মাস ইনডেক্স স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম থাকে। পিরিয়ডসের সমস্যা, শরীর বেশি শুষ্ক হয়ে যায়, পেশির দুর্বলতা, নখ শুষ্ক হয় ও অল্পেতেইই ভেঙে যায়, পেট গুড়গুড় করা বা ব্লটিং কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটব্যথা, ঘুমের ধরন পালটে যাওয়া ও সাউন্ড স্লিপ না হওয়া, মাথাব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব, ত্বক শুষ্ক হওয়া ও চুল ওঠা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিকের দেওয়া তথ্যকে অনুসরণ করে বলা যায় অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসার রোগীদের বেশ কিছু স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যও থাকে, যা তাদের অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে, যেমন— খুব কড়া ডায়েট মেনে চলা কিংবা সারাদিনে প্রায়ই উপোস করে থাকা, অতিরিক্ত এক্সারসাইজ করা, এত বেশি এক্সারসাইজ করে যে অনেক সময়ে শরীর তা নিতে পারে না, সারাদিনের খাবার এড়িয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণে লো ক্যালোরি খাবার খাওয়া। সকলের সামনে এরা কখনও খায় না, ইনসমনিয়া বা ঘুম না আসার সমস্যা, সবসময় এদের মধ্যে একটা খিটখিটে ভাব দেখা যায়, সামাজিক দিক থেকে এঁরা খাবার না খাওয়ার জন্য নানারকম ছুঁতো খুঁজতে থাকেন।

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা : অ্যানোরেক্সিয়ার সমস্যা হয়েছে কী না, তা চিকিৎসক ফিজিক্যাল এগজামিনেশন করে দেখতে পারেন। তার সঙ্গে রোগীকে কতগুলি প্রশ্ন করা হয়। শুধু কিশোরী নয়, সদ্য তরুণী বা যুবতীদের মধ্যেও এই সমস্যা থাকতে পারে। চিকিৎসক রোগীকে তাদের খাওয়ার ধরন বা খাবার সম্পর্কে কীরকম মনোভাব, সারাদিনে কতটা খাবার খায়, কী কী থাকে, কতক্ষণ ধরে কীরকম এক্সারসাইজ করে সমস্ত প্রশ্ন করেন ও তার কাউন্সেলিং করিয়ে রোগটির কারণ অনুসন্ধান করেন। এরপরে শুরু হয় চিকিৎসা। এতে একত্রে ওষুধ দিয়ে, পুষ্টিবিদের করা ডায়েট তালিকা ফলো করে ও রোগীকে কাউন্সেলিং ও বিহেভেরিয়াল থেরাপি করিয়ে খাবার সম্পর্কে তার ভীতি কমানো হয় ও ক্রমশ তাকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা হয়। এর সঙ্গে রোগীকেও সমানভাবে সহযোগিতা করতে হয়। বিহেভেরিয়াল থেরাপি করে খাবার খাওয়া সম্পর্কে তার মনোভাব বদল করা হয়। অ্যানোরিক্সায়া থেকে অপুষ্টি, অনিয়মিত হার্টবিট, ত্বক ও ঘুমের সমস্যা হলে তার আলাদা করে চিকিৎসা করাতে হয়। ▯

রাশিয়ার তেলে মধ্যপ্রাচ্যের আপত্তি

অনঙ্গদেব মিত্র

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পর সারা বিশ্ব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাশিয়ার ওপর। নানারকম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাশিয়াকে কোণঠাসা করার এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। চাপ ভারতের ওপরও ছিল। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকা ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল যাতে ভারত ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর জন্য রাশিয়ার নিন্দা করুক। কিন্তু ভারত তা করেনি। রাশিয়ার নিন্দা বা ইউক্রেনকে সমর্থন করার পথে না হেঁটে এই প্রসঙ্গে আগাগোড়া নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে ভারত। তাতে ব্রিটেন আমেরিকা-সহ বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি ক্ষুণ্ণ হলেও ভারতকে বাগে আনতে পারেনি। এরপর ভারত যখন রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিল তখনও ব্রিটেন-আমেরিকার মতো দেশগুলি ভারতকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল। তবে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ধোপে টেকেনি। একেবারে হালফিলের তথ্য অনুযায়ী ভারত তার প্রয়োজনের ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এখন রাশিয়া থেকে আমদানি করছে। এবং এর পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

২০১৯ সালের আগে ভারত তার প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি অর্থাৎ সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরিন, ইউ.এ.ই ও ইরান থেকে আমদানি করত। ২০১৯ সালে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এবং ভারত আমেরিকা থেকে তেল আমদানি শুরু করে। ২০১৯ সালেই মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ভারতের পেট্রোল-নির্ভরতা ৮৫ শতাংশ থেকে কমে ৬০ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়া থেকে পেট্রোল আমদানি শুরু করার পর তা আরও কমেছে। সুতরাং ভারতের এই নতুন পেট্রোলিয়াম নীতিতে সব থেকে ক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। সরাসরি কিছু না বললেও ভারতীয় মিডিয়ার একাংশ মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষোভ নানাভাবে উগরে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়। প্রোফেট মহম্মদকে নিয়ে বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র নূপুর শর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদে মধ্যপ্রাচ্যের অতি সক্রিয়তা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বিতর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্ন তুলেছেন যে এই অতি সক্রিয়তা তেল রপ্তানি কমে যাওয়ার ফলে নয় তো? এমনকী, কেউ কেউ এই অতি সক্রিয়তার পিছনে আমেরিকার হাত থাকার সম্ভাবনার কথাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নূপুর শর্মার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক মাথাচাড়া দেবার পর এখনও পর্যন্ত রাজস্থানের উদয়পুরে আর মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে দুটি খুন হয়ে গেছে। তার মধ্যে রাজস্থানের উদয়পুরে কানহাইয়ালাল নামের এক দর্জিকে গলা কেটে একেবারে আইসিসের কায়দায় খুন করেছে জিহাদিরা। নূপুর শর্মাকেও লাগাতার ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। উদয়পুরের ঘটনার তদন্তে নেমে এন.আই.এ ইতিমধ্যেই ধৃতদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ পেয়েছে। তবে পাকিস্তান নেহাতই চুনোপুঁটি। এইসব ঘটনার প্রকৃত কারণ যদি তেল রপ্তানি কমে যাওয়ার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষোভ হয় এবং তাতে

যদি আমেরিকা ইন্ধন জোগায় তাহলে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেকদিনের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বাসমতী চাল, গম, সবজি, ফল, দুধ— যা লাগে, তার সিংহভাগই যায় ভারত থেকে। ভারত যদি হাত তুলে দেয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যকে না খেয়ে মরতে হবে। অবস্থা কতটা ভয়াবহ তার প্রমাণ আমরা পাই, ভারত গম রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আনার কথা ঘোষণা করা মাত্র ইরানের বিদেশমন্ত্রীর ভারতে ছুটে আসার ঘটনায়। এরপরেও তাহলে কেন এই দ্বিচারিতা?

ইসলামিক ব্রাদারহুড বড়ো আজব জিনিস। পৃথিবীর কোনও এক দেশে মুসলমান আক্রান্ত হলে অন্য দেশের মুসলমানেরা জিহাদি প্রতিবাদে নেমে পড়ে। একথা যে ইসলামিক দেশের পকেটে টান পড়লেও সত্য তার প্রমাণ আমরা নূপুর শর্মার ঘটনাতে পাচ্ছি। স্বাধীনতার পর গত পঁচাত্তর বছর ধরে ইসলামিক ব্রাদারহুডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা। নূপুর শর্মার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকী, আইন ও সংবিধানের কণ্ঠরোধ করে সুপ্রিম কোর্টের এক মহামান্য বিচারকও জানিয়ে দিয়েছেন নূপুর শর্মার মন্তব্যের কারণেই খুন হয়েছেন কানহাইয়ালাল। বিচারকের রায় শুনে মনে হতে পারে যে নূপুর শর্মা যা করেছেন তাতে কাউকে না কাউকে ওইভাবে খুন হতেই হবে। সুতরাং সাধু সাবধান। নূপুর শর্মা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, আসল খেলাটা আরও বড়ো। □

নূপুর শর্মা কাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় যা যা ঘটানো হয়েছে তা মধ্যপ্রাচ্য ও তাদের অনুসারীদের অর্থনৈতিক হতাশার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

বাজার হারানোর হতাশায় তিল থেকে তাল

ভবানী শঙ্কর বাগচী

নিউজ চ্যানেলের ডিবেটে লাইভ অনুষ্ঠানে ভারতের রাজনীতিক নূপুর শর্মা একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। যার জেরে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরাইন, কাতার-সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলি ভারতকে ভর্ৎসনা করে। এমনকী বাণিজ্যিক বয়কটের হুমকিও দেওয়া হয়। নূপুর শর্মার মন্তব্যটি ছিল ধর্মীয়। হিন্দুধর্মের প্রতি করা একটি উস্কানিমূলক নোংরা মন্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়েই মন্তব্যটি করেছিলেন নূপুর। লক্ষণীয় বিষয়, যেদিন টিভিতে নূপুরের এই বিতর্কিত মন্তব্য দেখা গিয়েছিল, তার ৮-৯ দিন পর থেকে প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করে কিছু কিছু মানুষ। বিগত দিনের অসংখ্য ঘটনা ঘাঁটলে দেখা যাবে শান্তিপ্রিয় (?) মানুষগুলো যে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে থাকেন। তাহলে নূপুর শর্মার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটলো কেন? কেনই-বা নূপুর শর্মা ও মোদী সরকারকে ইসলাম বিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো?

গত এক দশকে ভারতে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। গত কয়েক মাসে জ্বালানি তেলের দাম লিটার প্রতি ১০০ টাকা ছাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলের মূল্যবৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ। জ্বালানি তেলের সেই আন্তর্জাতিক বাজারের নিয়ন্ত্রক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। পেট্রোল-ডিজেল, গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজারে মনোপলি ব্যবসার নিয়ন্ত্রক এরাই। তাই কোনও কারণ দেখিয়েই এরা যখন তখন তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় কারও কিচ্ছুটি করার থাকে না।

ভারত বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ জ্বালানি তেল ও গ্যাস আমদানিকারক দেশ। মোট চাহিদার ৮৫ শতাংশই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে। ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত যে দেশগুলো থেকে অত্যধিক তেল আমদানি করেছে তার মধ্যে শীর্ষে ছিল ইরাক। তারপর সৌদি আরব, ইউএই, কুয়েত, ওমান ও অন্যান্যরা। ওই সময়ে ভারত ১৯৩.৫ মিলিয়ন টন তেল আমদানি করেছে যার মূল্য ১০৫.৪ বিলিয়ন ডলার। এ পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি তেল আমদানি নিয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি ভারত। মার্চ ও এপ্রিলে ৬০ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানির জন্য মস্কোর সঙ্গে চুক্তি করে নয়া দিল্লি। রাশিয়ায় জ্বালানি তেলের নতুন উৎস পাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা কমছে ভারতের। গত এপ্রিলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির দরুন এদেশেও পেট্রোল- ডিজেলের দাম বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের জনগণের কথা মাথায় রেখে সরকারকে তুলনামূলক কম দামে কাঁচা জ্বালানি তেল আমদানির উৎস খুঁজতে হচ্ছে।' সেই সময়েই রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস আমদানির ইঙ্গিত দেন জয়শঙ্কর। মে মাসে রাশিয়া থেকে দিন প্রতি ৭৪০,০০০ ব্যারেল জ্বালানি তেল আমদানি করেছে ভারত। যেখানে গত বছর এপ্রিলে রাশিয়া থেকে এই আমদানির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪,০০০ ব্যারেল।

এই প্রথম নয়, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীলতা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে ভারত। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদেশে জ্বালানি তেল আমদানির খরচ কমানো এবং নতুন উৎস তৈরির উপর জোর দিয়েছিলেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জ্বালানি তেলের উৎস দেশের তালিকায় জুড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম। ফলে ওই চার বছরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতের জ্বালানি তেল আমদানির হার ছিল সর্বনিম্ন। ৮৫ শতাংশ থেকে এক ধাক্কায় তা হয়েছিল ৬০ শতাংশ। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৯ সালে মধ্যপ্রাচ্য থেকে দৈনিক গড়ে ২৬ লক্ষ ২০ হাজার ব্যারেল জ্বালানি তেল আমদানি করা

হয়েছিল যা বিগত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বা দৈনিক ১৮ লক্ষ ব্যারেল কম।

এদিকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ চালালে, আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাশিয়ার তেল রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় উপর উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় পেট্রোলিয়াম রপ্তানির জন্য নতুন ক্রেতা খুঁজতে থাকে রাশিয়া। আন্তর্জাতিক বাজারের নির্ধারিত দামের চেয়ে কম দামে তেল রপ্তানি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে পুতিন সরকার। তুলনামূলক কমদামে পাওয়া রাশিয়ার জ্বালানি তেল কিনতে এক মুহূর্তও ভাবেনি ভারত। আন্তর্জাতিক সংস্থা কেবলারের তথ্যানুযায়ী ভারতকে ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার ডিসকাউন্টে তেল রপ্তানি করছে রাশিয়া। যার ফলে আমদানি খরচ যেমন কমেছে, তেমনই মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় অনেক সস্তায় জ্বালানি তেল ও গ্যাস পাচ্ছে ভারত। তবে ভারত এখন আর সেই পুরনো ধাঁচে, আমদানি ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। সম্প্রতি ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরি জানিয়েছেন, রাশিয়া ছাড়াও সস্তায় জ্বালানি তেল রপ্তানি করা দেশগুলির সঙ্গে কথা চলছে। ভবিষ্যতে এমন আরও সম্ভাবনা তৈরির চেষ্টা করছে সরকার।

অতএব ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল জ্বালানি তেলের বাজার ক্রমশ হাতছাড়া হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের। এই মুহূর্তে 'গালফ কান্ট্রি' থেকে ভারতের আমদানি নেমে দাঁড়িয়েছে ৪০-৪৫ শতাংশে। তারা বুঝতে পারছে ভারত আর জ্বালানি তেলের জন্য তাদের মুখাপেক্ষী নয়। আন্তর্জাতিক বাজার হারানোর হতাশায় জল শুকোচ্ছিল পারস্য উপসাগরে। নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য তাদের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য অক্সিজেন দিল। বর্তমানে ভারত গণতন্ত্রের সরকার সামলাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নূপুর সেই দলেরই জাতীয় মুখপাত্র। অতএব নূপুরের মুখনিঃসৃত মন্তব্যকে দলের এবং সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য বলে সাব্যস্ত করবে তারা এটাই স্বাভাবিক। তাই মূল ঘটনার পর রীতিমতো সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, পরিকল্পিত ভাবে সামান্য ঘটনাকে এমন ধর্মীয় বাকবিতণ্ডার রূপ দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে যার বলি দুই হিন্দু। নূপুর শর্মা কাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় যা যা ঘটানো হয়েছে তা মধ্যপ্রাচ্য ও তাদের অনুসারীদের অর্থনৈতিক হতাশার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ■

ইট মারলে পাটকেল খাওয়ার ভয়ে ত্রস্ত মধ্যপ্রাচ্য

প্রোফেট হজরত মহম্মদকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে একে একে কোমর বাঁধতে থাকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। প্রতিবাদের জেরে কুয়েতের সুপার মার্কেট থেকে সরিয়ে ফেলা হয় ভারতীয় পণ্য। এদেশের পণ্য বয়কটের ডাক দেয় কাতার। মধ্যপ্রাচ্যে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ঘোষণা করা হয়, সৌদি আরব,বাহরাইন এবং অন্যান্য আরব দেশগুলির সুপারস্টোরে ভারতীয় পণ্য নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এমনকী বিতর্কিত মন্তব্যের জবাবদিহি করে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ইরান, কুয়েত ও কাতার। তার মধ্যেই বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ ভারতকে সমর্থন করে পাশে থাকার বার্তা দেয়। তাদের মধ্যে নেদারল্যান্ডসের আইনসভার সদস্য গির্ট উইল্ডার্স ভারতকে সমর্থন করে টুইট করেছেন। তবে ভারতের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের এই শুকনো প্রতিবাদ বেশিদিন স্থায়ী হবার নয়। কারণ ভারত যেমন মধ্যপ্রাচ্য থেকে কাঁচা জ্বালানি তেল আমদানি করে, তেমনি উপসাগরীয় দেশগুলিও ভারতের গম ও চালের ওপর নির্ভরশীল। মাঝে একবার ভারত যখন বিশ্বের বাজারে গম রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল, তাতে রীতিমতো সংকটে পড়ে মধ্যপ্রাচ্য। যেকারণে রপ্তানির পথ পুনরায় খুলতে তড়িঘড়ি এদেশে হাজির হয়েছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। নূপুর শর্মার মন্তব্যের লোক দেখানো প্রতিবাদ দীর্ঘস্থায়ী করলে প্রতিক্রিয়ায় ভারতও চাল রপ্তানিতে লাগাম দিতে পারে, সেসব আঁচ করেই পয়গম্বর বিতর্কে জল ঢালতে উদ্যোগী মধ্যপ্রাচ্য। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

তেলা মাথায় তেল দিতে নারাজ ভারত

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

১৯৭৩ সালে আমেরিকার মতো প্রগতিশীল দেশের ফিলাডেলফিয়া শহরের এক রেস্তরাঁর ছবি বিবিসি মারফত প্রকাশ্যে এসেছিল। রেস্তরাঁর মালিক নোটিশ দিচ্ছেন, 'closed until Monday 6 am due to energy crisis---by order of the Mayor'। তৃতীয় বিশ্ব মালুম করালো যে তারাও আছে। পশ্চিম জার্মানির বন শহরের রাজপথ নিঃশব্দ। সারা ইউরোপে পেট্রোল পাম্পে পিঁপড়ের মতো রাত জাগা লাইন। পশ্চিমের দেশে দেশে নোটিশ এসেছিল— কেউ ঘণ্টায় ৫০ মাইলের বেশি গতিতে গাড়ি চালাতে পারবে না। হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে সেদিন তেলের নিয়ন্ত্রণের হাত বদলের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো মিলে ওপেক (OPEC) গঠন করে তেলের দাম ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করে নাজেহাল করেছিল পশ্চিমি দুনিয়াকে। আজ এতো বছর পর আবার অনেকটাই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করাতে চেষ্টা করছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদককারী দেশগুলো।

এবার সেই আচরণ করতে চাইছিল এশিয়ার দেশগুলি বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে। করোনা মহাসংকট এবং তার গা লাগোয়া রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ওপেক দেশগুলি যেন তেল সরবরাহের ব্যাপারে ল্যাজ মোটা ভাব ছাড়তেই পারছে না। একে অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি, তার উপর সরবরাহ হ্রাস--- এই দুই জাঁতাকলে ভারতকে অনেকদিন থেকেই ফেলার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সময়টা যে এখন ১৯৭৩ না! সেদিন আমেরিকা পর্যুদস্ত হলেও আজকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ভারত তার কূটনৈতিক পারদর্শিতার জোরে বিকল্প তেল জোগানকারীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। সেই বিকল্প তেল জোগানকারীর নাম রাশিয়া।

এ বছরের শুরুর দিক থেকে অর্থাৎ যখন করোনার তৃতীয় ঢেউ শিথিল হচ্ছে, অর্থনৈতিক কাজে ক্রমশ গতি আসছে, তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক তখনই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আনে। ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারল প্রতি পৌঁছেছিল ৯৫ মার্কিন ডলারে! এ ফন্দি অবশ্য গত সাত বছর আগেই শুরু করেছিল। এমনকী ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দামও হয় ৯৩.১০ ডলার প্রতি ব্যারলে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিক থেকেই অপরিশোধিত

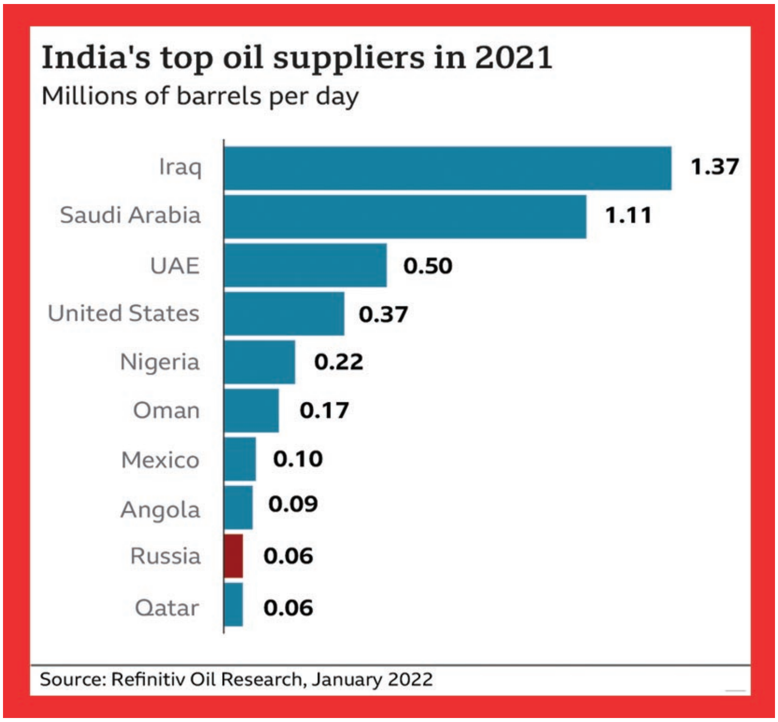

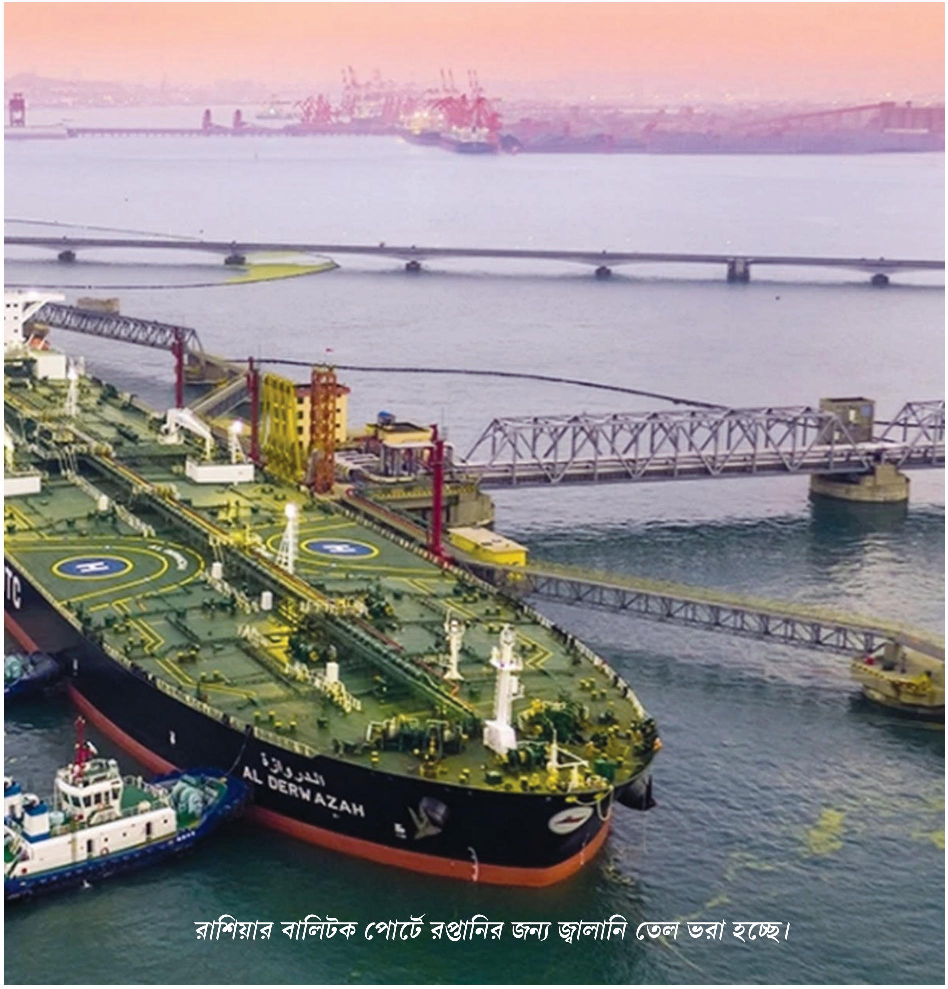

রাশিয়ার বালিটক পোর্টে রপ্তানির জন্য জ্বালানি তেল ভরা হচ্ছে।

তেলের দাম বিশ্ববাজারে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ওপেক। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ এবং হিটিং অয়েলের ক্ষেত্রে তা ৬ শতাংশ। তার আগেও জানুয়ারিতে অপরিশোধিত, ব্রেন্ট এবং হিটিং অয়েলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। যথাক্রমে ১৬, ১৫ ও ৫০ শতাংশ। করোনার পরবর্তী এক বছরে সবমিলিয়ে অপরিশোধিত, ব্রেন্ট ক্রুড এবং হিটিং অয়েলের মূল্য যথাক্রমে ৬১.৭১, ৫৬.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অ্যারামকো এপ্রিল মাস থেকে ক্রুড তেলের দাম পুনরায় নির্ধারণ করতে শুরু করে। অ্যারামকো এপ্রিলের শেষে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এশিয়ায় বিক্রি করা সব ধরনের অপরিশোধিত গ্রেডের অফিশিয়াল বিক্রয় মূল্য (ওএসপি) ব্যারল প্রতি ৪.৯৫ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করছে। এর সঙ্গে তারা ইচ্ছাকৃত রপ্তানি ঘাটতি তৈরি করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকসও নিশ্চিত করে বলেছে মধ্যপ্রাচ্যের এ এক নতুন তেল সরবরাহ কূটনীতি। ২০২১-এর ওপেক বৈঠকে ভারত এক অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হয়। তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যখন ওপেককে তেলের মূল্যে লাগাম দেওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেন, তখন সৌদির পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী প্রিন্স আব্দুল্লাজিজ বিন সালমান সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতি দেন— ভারত গত বছর স্বল্প মূল্যে যে তেল ক্রয় করেছে (১৬.৭১ মিলিয়ন

রাশিয়ার ভলগোগ্রাদে অবস্থিত লুক অয়েল গ্রুপের তেল শোধনাগার।

ফঃ ৪

ব্যারল স্ট্রাটেজিক রিজার্ভার, এপ্রিল-মে ২০২০) বরং সেটাই ব্যবহার করুক। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তেল সরবরাহ এবং মূল্য বৃদ্ধিতে ভারতের যে বনিবনা হচ্ছিল না তা স্পষ্ট এবং তেলের ক্রয়কারী দেশ হিসেবে ভারতে তার দূরত্ব কয়েক মাইল বৃদ্ধি করার সুযোগ পেল ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে।

বিশ্বের তৃতীয় তেল আমদানিকারক এবং ব্যবহারী দেশ হিসেবে তো ভারত হাত গুটিয়ে থাকতে পারে না। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়ার থেকে তেল আমদানিতে কার্যত তালা ফেলে দেয়। Kepler's-এর তথ্যানুযায়ী জুন মাসে রাশিয়া থেকে ভারতে দৈনিক গড়ে ১.২ মিলিয়ন ব্যারল তেল আমদানি হয়েছে। যা প্রথমবার ইরাকের দৈনিক ১.০১ মিলিয়ন ব্যারল সরবরাহকে ছাপিয়েছে। ভারতের কাছে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং উৎপাদন সর্বোচ্চ প্রাধান্য পায়, তাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়াতে স্যাংকসান রাখলেও ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত প্রায় নিরপেক্ষ ভূমিকায় উপস্থিত। ফলস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যকে ক্রমে ক্রমে এড়িয়ে রাশিয়ার অপেক্ষাকৃত সস্তার ক্রুড তেল আমদানি করতে সক্ষম হচ্ছে ভারত। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সদ্য মন্তব্য করেছেন— 'when the price goes up and you are left with no option, you will buy from anywhere' এবং এও বলেন— 'we have a very well defined understanding of what India's interests are'— ভারতের আগ্রহ যতোটা সম্ভব ন্যায্য মূল্যের তেল জোগান এবং দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি।

তাই তেলের ঠিকানায় রাশিয়ার গুরুত্ব ভারতের কাছে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মুহূর্তে ভারতের ক্রুড বাস্কেট তেলের ১০ শতাংশ সরবরাহ করছে রাশিয়া। যা ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ছিল মাত্র ০.২ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, এই আমদানিকারীর ৪০ শতাংশ রিলায়েন্স এবং নায়রার মতো বেসরকারি সংস্থা। এ বছর মে মাসেই প্রায় ২৫ মিলিয়ন ব্যারল ক্রুড তেল রাশিয়ার থেকে নেয় ভারত। যা এ বছর এপ্রিলে দৈনিক আমদানি ছিল ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ব্যারল, কিন্তু গত বছর সেই মাসেই তা ছিল দৈনিক ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ব্যারল। রাশিয়ান ক্রুডের আমদানি যথাক্রমে ২০২০ এবং ২০২১-এ যেখানে দৈনিক ১৬ হাজার এবং ৩২ হাজার ব্যারল ছিল তা ২০২২-এর মার্চের পর থেকে বিগত বছরের তুলনায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার থেকে ভারত প্রতি ব্যারল তেল ৩০ মার্কিন ডলারে পাচ্ছে। ৪ মে, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রক এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে, ভারতের এ মুহূর্তে দৈনিক পেট্রোলিয়াম ব্যবহার ৫ মিলিয়ন ব্যারল এবং পরিশোধন ক্ষমতা ২৫০ এমএমটিপিএ। তাই প্রত্যেক দেশবাসীর জ্বালানি সমস্যায় যে জ্বালা পশ্চিমের দেশগুলোর হয়েছিল ভারত সে সুযোগ কিছুতেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে দেবে না। বিশ্ব বাজারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ হ্রাস করে ভারতের উদ্বেগ বাড়ানোর আগেই আরও এক সুখবর এসেছে রাশিয়ার শক্তি বিভাগীয় প্রধান সংস্থা রোসনেফট-এর পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই পিচোরা সমুদ্র অগভীর অঞ্চলে আনুমানিক ৮২ মিলিয়ন টনের তেল ভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে যা ভারতের তেল গ্রহণের সুযোগ আরও ত্বরান্বিত করবে। নর্দান সি রুট ব্যবহার করে অনেক কম ব্যয়ে এবং সময়ে ভারত রাশিয়ান অঞ্চলের 'আর্টিক অয়েল' আমদানিতে অতি আগ্রহী। কূট ও অর্থনৈতিক ভাবে অবশ্যই এটা মধ্যপ্রাচ্যকে কড়া জবাব। যারা করোনা পরবর্তীতে কৃত্রিম অচলাবদ্ধার মাধ্যমে ভারতের তেলের সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করছিল তারা এতোদিনে এই বার্তা নিশ্চয়ই পেয়েছে যে, মে মাসেই রোসনেফট ৭ লক্ষ টন তেল বালটিক পোর্ট মাধ্যমে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে দিয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ অনুঘটকের মতো ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করলেও এর প্রস্তুতি মধ্যপ্রাচ্যকে একটু একটু করে এড়িয়ে বেশ আগে থেকেই ভারত শুরু করেছিল। যারা ভারতের মোট অপরিশোধিত তেলের ৮৪ শতাংশ সরবরাহ করত তাদের থেকে আমদানি ২০১৯-এ নেমে আসে ৬০ শতাংশে। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই বছর মধ্যপ্রাচ্য থেকে দৈনিক গড়ে ২৬ লক্ষ ২০ হাজার ব্যারল জ্বালানি আমদানি করে ভারত যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বা দৈনিক গড়ে ১৮ লক্ষ ব্যারেল কম। তাই করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের আগেই ভারত জ্বালানি মিত্রতার পথ পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিল। মরুঝড়েও চোখ খুলে চলার নাম কূটনীতি যে পথে আজকের ভারত যথেষ্ট স্বাবলম্বী এবং পরিণত। জ্বালানি কূটনীতিতে ভারত যেন ফ্রান্সের সেই দ্য ভার্তকাপোয়েন-এর মতো। যে ভাস্কর্য যুগলে পিছন থেকে একজন পা টেনে ধরেছে তাও দ্বিতীয়জন দিব্যি নিয়ন্ত্রণে স্থির। সে হুমড়ি খায় না। প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমী মূর্তিটাই অধিক আলোচ্য প্রতিবন্ধকের চাইতে। ভারত জৈব জ্বালানিতে এ মুহূর্তে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম সচেষ্ট দেশ। তাই তা চর্চার বিষয়। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

রথীন্দ্র মঞ্চে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি সমারোহ

কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে উদ্যোগে গত ২ জুলাই স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চ সভাগারে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি সমারোহের ১৭তম সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. রাজশ্রী শুক্লা। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রুপা গ্রুপের চেয়ারম্যান পদ্মশ্রী প্রহ্লাদ রায় আগরওয়াল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ে অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী ড. হিমাংশু বাজপেয়ী, ড. প্রজ্ঞা শর্মা (লখনউ), এবং চেন্নাইয়ের বেদান্ত ভরদ্বাজের নির্দেশনায় কিস্সাগোঈ শৈলীর ‘গঙ্গাগাথা’ গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য, স্বর্গীয় বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর পিতৃদেব গাঙ্গেয় নরোত্তমজী বাল্যকালে গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিলেন, কিন্তু মা গঙ্গার কৃপায় বেঁচে যান। সেজন্য ‘গঙ্গা পুত্রের’ স্মৃতিতে এই গীতিআলেখ্যের আয়োজন করা হয়। গীতি আলেখ্যে মা গঙ্গার মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকে দূষিত করার অমানবিক আচরণের করুণ কথা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অশ্রুসজল করে তোলে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় শিল্পী সত্যনারায়ণ তিয়াড়ী শ্রীরাম বন্দনা পরিবেশন করেন।। সমগ্র অনুষ্ঠান কুশলভাবে সঞ্চালনা করেন ড. কমল কুমার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বজাজ।

সারদা শিশু তীর্থে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ২৫ জুন শিলিগুড়ির সারদা শিশু তীর্থ সেবক রোড উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এবং রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী জুনাইনা পারভিনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সভাগৃহে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সম্পাদনায় সংগীত, নৃত্য ও স্তোত্রপাঠের পর কৃতীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী জুনাইনা পারভিনের হাতে স্মারক উপহার-সহ ‘ড. প্রণবেশ রায় স্মৃতি মেধা পুরস্কার’ এবং বিদ্যালয়ের উপহারের অর্থমূল্য ৩২ হাজার ১ টাকা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানকে মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ করেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক পবন কুমার নাকিপুরিয়া, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ প্রধানাচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস, প্রধানাচার্য নির্ভয়কান্তি ঘোষ, কৃতী ছাত্রী জুনাইনা পারভিন এবং বিদ্যালয়ের সংগঠক বিপ্লব সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী সোমদত্তা মাজী চক্রবর্তী, সুশ্রী অর্চনা তিওয়ারী। সহযোগিতায় ছিলেন বলরাম ধর।

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের বার্ষিক যোজনা বৈঠক

কলকাতা মহানগরের সুবিখ্যাত সামাজিক সংস্থা রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের বার্ষিক যোজনা বৈঠক সম্পন্ন হয় গত ২৬ জুন বড়বাজারের বেলিয়াঘাটা স্থিত পবনপুত্র সভাগারে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী এবং পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ তথা রাম-শরদ স্মৃতি সঙ্ঘের সংরক্ষক বিদ্যুৎ মুখার্জি। মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন হরিদ্বারের দিব্য প্রেম সেবা মিশনের সংস্থাপক ড. আশিস গৌতম। উপস্থিত ছিলেন বলিদানী কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগিনী তথা সংস্থার সংরক্ষক পূর্ণিমা কোঠারী। বৈঠকে সংস্থার সভাপতি রাজেশ আগরওয়াল (লালা) বিগত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ করেন। তাতে প্রতিভা সম্মান, রক্তদান শিবির, কার্তিক পূর্ণিমা (বলিদান দিবস), হিন্দু নববর্ষ স্বাগতোৎসব ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন বিগত করোনা মহামারী ও আমফানের মতো দুর্দিনে সংস্থার সদস্যরা কীভাবে সেবার হাত বাড়িয়ে মানুষের পাশে ছিলেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। বিগত বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন সংস্থার সম্পাদক রজত চতুর্বেদী। বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন বিশাল বাগলা। বৈঠকে রাজেশ আগরওয়ালকে পুনঃ সংস্থার অধ্যক্ষ ঘোষণা করে নতুন কার্যসমিতি গঠিত হয়। বৈঠক পরিচালনা করেন অশোক জয়সোয়াল এবং ধন্যবাদ জানান রজত চতুর্বেদী।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী অন্তর্বিদ্যালয় কাব্য আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

কলকাতার প্রাচীনতম লাইব্রেরি বড়াবাজার লাইব্রেরির আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সভাগারে গত ৩ জুলাই বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী অন্তর্বিদ্যালয় কাব্য আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। লাইব্রেরির অধ্যক্ষ মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল উপস্থিত প্রতিযোগী ও তাদের অভিভাবকদের স্বাগত জানান।

প্রতিযোগিতায় 'এ' বিভাগ থেকে শ্রীশ্রী অ্যাকাডেমির অংশিকা টিবরেওয়াল প্রথম স্থান, বি ডি এম ইন্টারন্যাশনালের দিব্যাংশী দাস ও সপ্তর্ষি দত্ত দ্বিতীয় স্থান এবং লা মার্টিনিয়র ফর বয়েজ-এর সম্বিত তাপরিয়া ও শ্রী শিক্ষায়তনের আশ্রিতা সিংহ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 'বি' বিভাগ থেকে শ্রী শিক্ষায়তনের অশ্বিকা সিংহ প্রথম স্থান, বি ডি এম ইন্টারন্যাশনালের ভক্তি ত্রিপাঠী দ্বিতীয় স্থান এবং লিলুয়া ডন বসকোর রৌণক পাণ্ডে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 'সি' বিভাগ থেকে লায়ন্স ক্যালকাটা গ্রেটার বিদ্যামন্দিরের শিখা সিংহ প্রথম স্থান, লা মার্টিনিয়র ফর বয়েজের আদিতরাজ সিংহ দ্বিতীয় স্থান এবং লায়নস ক্যালকাটা বিদ্যামন্দিরের স্নেহা ভট্টাচার্য তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী লিখিত পুস্তক এবং একটি করে ব্যাগ দিয়ে সম্মানিত করেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

অনুষ্ঠানে প্রোফেসর কমল কুমার, মোহন তিয়াড়ী, শ্রীমতী কুসুম লুণ্ডিয়া, সুরেশ চৌধরী, অ্যাডভোকেট নন্দলাল সিংহানিয়া-সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক অশোক গুপ্তা। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নাগপঞ্চমী একটি সর্বভারতীয় পূজা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পুজোয় ঢাক বাজে। কিন্তু প্রচারের ঢাক তেমন বাজে না, তবুও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে কটি পূজাপার্বণ একই সঙ্গে পালিত হয় তার অন্যতম নাগপঞ্চমী পূজা। শ্রাবণ মাসের শুক্লা অথবা কৃষ্ণাপঞ্চমীতে ভারতজুড়ে হয় এই পূজা। তাই-বা কেন, হিন্দুদের সঙ্গে একই সঙ্গে পর্বটি পালন করেন বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও। ভারতীয় সহধর্মিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই এ এক বিরল নজির।

নাগপঞ্চমী একদিক থেকে সমন্বয়ের পূজাপার্বণ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৌরাণিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা লৌকিক আচার। এটি শুধুই সর্পদেবতার পূজা নয়, একইসঙ্গে এটি সর্পমাতা মা মনসারও পূজা। পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের কামনায় এই পূজা করা হয়। আবার এর সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে ভ্রাতৃমঙ্গলের বিষয়টি।

হিন্দু সংস্কৃতিতে ভাই-বোনের সম্পর্কটা শুধুই প্রীতির নয়, এর সঙ্গে রয়েছে ভাই-বোনেদের সুস্থ সুন্দর নিরাপদ জীবনের প্রার্থনাও। ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় যেমন পালন করা হয় ভাইফোঁটা ও রাখিবন্ধন উৎসব, ঠিক একই শুভকামনায় বোনেরা এদিন বিশেষভাবে নাগপঞ্চমীর পূজা করে। তাই বলা যায়, নাগপঞ্চমী শুধুই একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি একটি সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনের আন্তরিক কামনায় পালিত একটি পূজা ও ব্রত। তথাকথিত সর্বজনীন পূজার মতো নাগপঞ্চমী পূজার আয়োজন না হলেও এটি প্রায় প্রতিটি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের শুদ্ধ কামনা প্রসূত একটি অনুষ্ঠান। বহিরঙ্গের জাঁকজমক না থাকলেও আন্তরিক পরিশুদ্ধতায় নাগপঞ্চমী পূজা অবশ্যই এক অনন্য অনুষ্ঠান।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, নাগপঞ্চমী পূজার উৎসে রয়েছে এক ধরনের ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আদিম জনসমাজের দৈবী নির্ভরতার একটি নির্দশন এই সর্পপূজা বা নাগপঞ্চমীর পূজা। শ্রাবণ মাসে ঘন বর্ষায় গ্রাম ভারতের মাঠঘাট সব ডুবে যায় জলের নীচে। তাতেই বাস্তুহারা হয় সাপের দল। গর্ত থেকে বেরিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তখন আর মাঠঘাট, বনজঙ্গল বা পাহাড় কন্দর নয়, বাসস্থান ও খাদ্যের টানেই তারা ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে। সেই কারণেই বর্ষাকালে সাপের কামড়ে মারা যান অসংখ্য মানুষ। অনেকেই প্রায় বিনা চিকিৎসায়। আর সে কারণেই সাপের কামড় থেকে রেহাই পেতে, মানুষ শুরু করে সর্পপূজা। প্রথমে যা ছিল নেহাতই একটি লৌকিক আচার সেটাই পরবর্তীকালে নানা পৌরাণিক কাহিনি এবং পূজা পদ্ধতির প্রয়োগে হয়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক পূজার আধার। নির্দিষ্ট হয় এর পূজা পদ্ধতি। সেইসঙ্গে সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে মনসা পূজারও প্রবর্তন হয়।

নাগপঞ্চমীর বিশেষত্ব, এই পূজার সর্প দেবতার সঙ্গে অষ্টনাগের এবং সর্পের দেবী মা মনসারও পূজা করা হয়। বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, এই পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারত ও বিভিন্ন পূরাণের নানা কাহিনি। সেইসঙ্গে লৌকিক ব্রতকথার মতোই আছে কিছু গল্পকথাও।

নাগপঞ্চমীতে পূজা করা হয় সাপের। কিন্তু কেন? সাপের উৎপাত ও তার কামড় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেবীর কৃপা পাওয়ার জন্য এই পূজার প্রবর্তন হয় সারা ভারতে। স্বভাবতই এই পূজার প্রধান চরিত্র সাপ। এই সাপের উৎপত্তি সম্পর্কে লিঙ্গপুরাণে একটি কাহিনি রয়েছে।

একদা সৃষ্টি করতে বসে ব্রহ্মা হঠাৎই হতাশ হন। কিছুতেই তিনি তাঁর মনোমতো সৃষ্টি করতে পারছেন না। এই না-পারার ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হন ব্রহ্মা। সেই ক্রোধে তাঁর দু'চোখ ভরে ওঠে জলে। সেই জল গড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর উপর। পৃথিবীর ওপর পড়া সেই অশ্রুজল থেকে সৃষ্টি হয় সাপের। কিলবিল করা সাপে ভরে যায় পৃথিবী। তাদের হিসহিসানি, দংশনে পৃথিবীতে নেমে আসে অনর্থ। সেই অনর্থ সামলাতে আসরে নামেন সূর্য। তিনি সাপেদের পঞ্চমী তিথির অধিপতি করে দেন। তাতে শান্ত হয় সেই সর্পকুল, আর পৃথিবীতে সেই থেকে পঞ্চমী তিথিতে বিশেষ করে শ্রাবণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী ও কৃষ্ণা পঞ্চমীতে নাগপঞ্চমী পূজার প্রবর্তন হয়।

নাগপঞ্চমীর দিনে সাধারণ সাপের সঙ্গে সাপেদের রাজা ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে কথিত অষ্টনাগের পূজা করা হয়। বিভিন্ন পুরাণ ইত্যাদি থেকে এই অষ্টনাগের নাম জানা যায়। তারা হলো, বাসুকী, তক্ষক, কালীয়, মণিভদ্রক, এরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কটক, ধনঞ্জয়। ভবিষ্যপুরাণের

৩২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এই নামগুলি।

অষ্টনাগ হলো সাপ বা নাগেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে কোথাও কোথাও দ্বাদশ নাগদেবতার নাম পাওয়া যায়। এই দ্বাদশ নাগদেবতার নামের তালিকাটা এইরকম : অনন্ত, বাসুকী, শেষ, পদ্ম, কম্বল্য, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কটক, অশ্বতর, শঙ্খুপলা, কালীয়, তক্ষক ও পিঙ্গল। পুরাণ মতে সাপেরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন, দিব্য শ্রেণীতে পড়ে বাসুকী, তক্ষক, শেষ, অনন্ত ইত্যাদি। এছাড়া আর সব সাপই ভৌম শ্রেণীভুক্ত। অষ্টনাগ আবার তিনটি বর্ণে বিভক্ত। তিনটি ব্রাহ্মণ, তিনটি ক্ষত্রিয় এবং দুটি বৈশ্য।

পুরাণকথা, বিষ্ণুর তমোগুণ থেকে জন্ম হয় শেষনাগের। শেষ নাগ মতান্তরে বাসুকী তার ফণার ওপর এই পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে। এর থেকে একটি প্রচলিত বিশ্বাস, একটি ফণার ওপর পৃথিবীকে ধারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য ফণার ওপর পৃথিবীকে রাখে। এক ফণা থেকে অন্য ফণায় স্থানান্তরের সময় পৃথিবী একটু নড়ে যায়। আর এরই ফলে হয় ভূকম্প। এটা অবশ্য নেহাতই লোকবিশ্বাস, এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের নানা লোককথাতেই অবশ্য এ জাতীয় কিছু কিছু কাহিনি আছে যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

একদিক থেকে শেষ নাগ আবার বিষ্ণুর অবতার। ত্রেতায় তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম। পুরাণেই আছে কল্পনান্তরে সারা বিশ্ব যখন প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন থাকে, তখন বিষ্ণু এই শেষ নাগকে শয্যা করেই যোগনিদ্রায় অভিভূত থাকেন। এসব কারণে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সাপেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অনন্ত বা শেষনাগ। এবং তিনি স্বয়ং হলেন এই অনন্ত বা শেষ নাগ।

কিংবদন্তী নাগ বা সাপেদের আধিক্যের কারণেই মহারাষ্ট্রে নাগপুর নামটি যুক্ত হয়েছে শহরের নামের সঙ্গে। একই ভাবে, সাপকে বলা হয় ভুজঙ্গ। সেই ভুজঙ্গ থেকে কচ্ছ অঞ্চলের ভুজ শহরটির নামকরণ হয়েছে। নাগপঞ্চমী পূজার উদ্ভব সম্পর্কে মহাকাব্য, পুরাণ ও লোককথায় আছে নানা কাহিনি। তার মধ্যে মহাভারতের কাহিনিটি অবশ্য প্রায় সকলেরই জানা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে রাজা হন অর্জুনের নাতি পরীক্ষিৎ। ব্রহ্মশাপে তক্ষক নাগের দংশনে মারা যান রাজা। আর তারই প্রতিশোধ নিতে পৃথিবী থেকে সর্পবংশ বিলোপের কঠিন সংকল্প নিয়ে শুরু করেন সর্পনিধন যজ্ঞ। সে যজ্ঞে ঋত্বিকরা মন্ত্র পড়ে আহুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সাপ যজ্ঞকুণ্ডে পুড়ে মারা যায়। ভয় পেয়ে তক্ষক আশ্রয় নেয় ইন্দ্রের। ঋত্বিকরা তখন ইন্দ্র-সহ তক্ষককে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য মন্ত্র পড়তে থাকেন। এক মহা বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দেবতারা ছুটে যান মা-মনসার কাছে। তিনি যজ্ঞে পাঠান তাঁর পুত্র আস্তিক মুনিকে। রাজা জনমেজয় যজ্ঞভূমিতে আগত আস্তিকের শাস্ত্রজ্ঞান, প্রখর যুক্তি এবং দেবসম আচরণ দেখে মুগ্ধ হন। আস্তিকের অনুরোধে তিনি বন্ধ করেন যজ্ঞ। বেঁচে যায় তক্ষক এবং আরও সর্পকুল। ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রাবণের পঞ্চমী তিথিতে। আর তারপর থেকেই ওইদিনে শুরু হয় মা-মনসা শুভ নাগপঞ্চমীর পূজা।

লোককথা, জমিতে চাষ করার সময় এক কৃষকের লাঙলের আঘাতে মারা যায় দুটি সাপ। এই ঘটনায় সর্পমাতা প্রচণ্ড রেগে যান সন্তান বিয়োগের শোকে। সেই রাতেই সর্পমাতা সেই কৃষক, তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে দংশন করে হত্যা করে। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে বাবা-মা ও দুই ভাইকে সাপের কামড়ে নিহত দেখে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর বনে গিয়ে সর্পমাতার পুজো ও নানাভাবে স্তব করে পরিবারের সকলের প্রাণভিক্ষা করে। মেয়েটির প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে সর্পমাতা সকলের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। সেইসঙ্গে পৃথিবীতে সর্পপূজা চালু করার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী। পরিবারের সকলকে ফিরে পেয়ে মেয়েটি ওই দিন সর্পপূজা শুরু করে। তারপর থেকেই চালু হয়েছে নাগপঞ্চমীর পূজা।

লোককথার আরেকটি কাহিনিতে নাগপঞ্চমী পূজার সঙ্গে ভাইফোঁটা ও রাখিবন্ধনের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। একটি মেয়ে সর্পপূজা করার জন্য তার ভাইকে কেতকী ফুল আনতে পাঠায়। ছেলেটি কেতকী ফুল তোলার সময়ে এক সাপের কামড়ে মারা যায়। খবর পেয়ে মেয়েটি তো কান্নায় আকুল। তারপর একটু স্থির হয়ে উপোস করে সর্পদেবীর স্তুতি করতে থাকে। মেয়েটির নিষ্ঠায় তুষ্ট হন দেবী। মেয়েটির ভাইয়ের জীবন ফিরিয়ে দেন তিনি। সেদিন থেকেই নাগপঞ্চমীর দিন সর্পপূজায় ভাইদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। দেবীর পূজা করে ভাইয়ের জীবন ফিরে পাওয়ার কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকেই নাগপঞ্চমীর পূজার অঙ্গ হয়ে ওঠে এই ভ্রাতৃ-কল্যাণের বিষয়টি।

এই ভাবে সারা ভারতেই নাগপঞ্চমীর পূজার চলন হয়। দেশের নানা জায়গায় সর্প-মন্দির রয়েছে। তবে তার মধ্যে বিখ্যাত হলো উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরের তিনতলায় অবস্থিত নাগেন্দ্রেশ্বরের মন্দিরটি। মন্দিরটি বছরের সবসময় বন্ধ থাকে, কেবল নাগপঞ্চমীর দিন মন্দিরটি খোলা হয়। মন্দিরের দেবতার রূপটিও বেশ অভিনব। দশফণার একটি সাপের মাথায় রয়েছে মহেশ্বর ও পার্বতীর মূর্তি। তার চারদিকে রয়েছে গণেশ ও অন্যান্য দেবতার বিগ্রহ। কিংবদন্তী এই মন্দিরেই থাকত তক্ষক নাগ। সকলের বিশ্বাস, নাগপঞ্চমীর দিনে এই মন্দিরে পূজা দিলে সর্পদোষ, নাগদোষ ও অন্যান্য সব দোষের অবসান হয়।

নাগপঞ্চমীর দিনে গ্রামের সকলে বনে গিয়ে সাপের গর্তে দুধ ঢেলে সাপের পূজা করেন। বহু জায়গায় একইসঙ্গে করা হয় মা-মনসার পূজা। মেলাও বসে। নাগপঞ্চমীর দিনে সাধারণত ময়দা হলুদ দিয়ে সাপের মূর্তি গড়ে দুধ ও অন্যান্য উপচার দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। অনেকে বাড়ির দেওয়ালে সাপের ছবি টাঙিয়ে বা এঁকে পূজা করেন। এই নাগপঞ্চমীর পূজা বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ও নেপালেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের কাহিনিতে আছে বুদ্ধকে রক্ষা করেছিলেন এক সাপ। জৈন পুরাণেও আছে, বুদ্ধের মতোই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জীবন দান করেছিল সর্পদেবতা। এ কারণেই নাগপঞ্চমীর দিনে দুই সম্প্রদায়েই ষোড়শোপচারে সর্প দেবতার পূজা করা হয়।

সব মিলিয়ে ভারতীয় জীবনের ঐক্য এবং সংহতির প্রতীক এই নাগপঞ্চমী পূজা। সব রকম ভেদাভেদ ভুলে সকলেই শামিল হন সর্প পূজায়। তাই এই পূজা জাতীয় ঐক্যরও প্রতীক।

(নাগপঞ্চমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করেন শ্রীমল্লিকার্জুন

সূর্যশেখর হালদার

কাশ্যাং তু মরণাৎ মুক্তি, স্মরণাৎ অরুণাচলে, দর্শনাদেব শ্রীশৈলে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

(কাশীতে মরলে মুক্তি, অরুণাচলে স্মরণে মুক্তি এবং শ্রীশৈলে দর্শনে মুক্তি)

পবিত্র শ্রীমল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর তটে শ্রীশৈলম পর্বতের উপর অবস্থিত। এই পর্বতকে দক্ষিণের কৈলাস বলা হয়। মহাভারত, শিব পুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মহিমা ও মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। একবার ভগবান শঙ্করের দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশ বিবাহের জন্য পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন। প্রত্যেকে নিজের বিবাহ যাতে আগে হয় তার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের দু'জনকে বিবাদ করতে দেখে ভগবান শঙ্কর ও মাতা পার্বতী বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আগে সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করে এখানে ফিরে আসবে তার বিবাহ প্রথম দেওয়া হবে।'

মাতা ও পিতার এই কথা শুনে কার্তিকেয় দ্রুত পৃথিবী পরিক্রমা করতে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গণেশের পক্ষে এই কাজ ছিল বড়ো কঠিন। আকৃতিতে তিনি স্থূলকায়, তাছাড়া তাঁর বাহন হলো মূষিক। তিনি কীভাবে কার্তিকের সঙ্গে দৌড়ে সমকক্ষ হবেন? কিন্তু গণেশ ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি অবিলম্বে পৃথিবী পরিক্রমার এক সহজ উপায় বার করলেন। তিনি উপবিষ্ট মাতা-পিতাকে পূজা করে তাঁদের সাত বার প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী পরিক্রমার কাজ সম্পূর্ণ করে নিলেন। এই কাজ ছিল শাস্ত্র অনুমোদিত।

'পিত্রোশ্চ পূজনং কৃত্বা প্রক্রান্তিং চ করোতি যঃ।, তস্য বৈ পৃথিবীজন্যং ফলং ভবতি নিশ্চিন্তম্।'

সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করে কার্তিক যখন ফিরলেন, ততদিনে সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামধারী দুটি কন্যার সঙ্গে গণেশের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্ষেম ও লাভ নামক দুটি পুত্রও হয়েছে। এইসব দেখে কার্তিকেয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রৌঞ্চ (শ্রীশৈলম) পর্বতের উপরে চলে গেলেন। শিব ও পার্বতী তখন চললেন তাঁদের পুত্র কার্তিকের মানভঙ্গ করতে, কিন্তু গিয়ে দেখলেন কার্তিক সেখান থেকে চলে গেছেন। ভগবান শঙ্কর বললেন যে তিনি সেখানেই থাকবেন এবং অপেক্ষা করবেন কার্তিকের জন্য। তখন তিনি লিঙ্গ মূর্তি ধারণ করেন, যা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীমল্লিকার্জুন। তাঁকে সর্বপ্রথম মল্লিকা পুষ্প দ্বারা অর্চনা করা হয় বলে তাঁর নাম মল্লিকার্জুন।

দ্বাপর যুগের একটি কাহিনি অনুযায়ী একবার নাল্লামালাই পাহাড়ে শিলাদি মুনি কঠোর তপস্যা করছিলেন বছরের পর বছর ধরে। মহাদেব সেই সাধনায় তুষ্ট হয়ে শব্দব্রহ্ম রূপে উপস্থিত হলেন শিলাদি মুনির সামনে। ভগবান শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বর চাও?'

শিলাদি মুনি বর হিসেবে একটি পুত্রসন্তান কামনা করলেন। যথারীতি শিলাদি মুনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। সেই পুত্র ছোটোবেলা থেকেই ছিল শিবভক্ত। সেও চায় শিবের দর্শন। কিন্তু মানব দেহের পক্ষে মহাজ্যোতির তেজ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাই বারবার দৈববাণী দিয়ে তাঁকে সাবধান করতে লাগলেন দেবাদিদেব। কিন্তু শিলাদি পুত্র সে কথা শুনল না। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব আবির্ভূত হলেন। সে এক তেজোময় মহাজ্যোতি! তার প্রভাবে অন্ধ হয়ে গেলেন শিলাদি মুনির ছেলে, আর বিলীন হয়ে গেলেন সেই মহা জ্যোতির মধ্যে। সেই মহাজ্যোতি জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে রয়ে গেল শ্রীশৈলম পাহাড়ের উপরে।

আরও একটি কাহিনি অনুযায়ী শ্রীশৈলম পর্বতের নিকটবর্তী জঙ্গলে বনবাসী চেঞ্চু ভীলেরা তাদের আরাধ্যা দেবী পার্বতীকে তাদের কন্যা বলে মনে করত। সেই সূত্রে তারা মল্লিকার্জুনকে নিজেদের জামাই ভাবত। বনবাসী চেঞ্চু ভাষায় 'চেঞ্চু মল্লিহা' মানে নিজের জামাই। এই মল্লিহা থেকে মল্লিকা এসেছে। আজও বিশেষ উৎসবের দিনে চেঞ্চু বনবাসীদের বিশেষ সম্মানের স্থান থাকে।

আরেকটি কাহিনি বলে, এই সেই স্থান যেখানে অর্জুনের সঙ্গে কিরাত বা ব্যাধবেশী মহাদেবের যুদ্ধ হয় এবং ভগবান মহাদেব

অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। কথিত আছে, অর্জুন পরবর্তীসময়ে শ্রীশৈলম এসে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে এই জ্যোতির্লিঙ্গের নাম জড়িয়ে গিয়েছে।

শ্রীমল্লিকার্জুনের আদি মন্দিরটি ছোটো। পর্বত শীর্ষে একটি বটগাছের নীচে অবস্থিত। বর্তমান মন্দির সম্ভবত বিজয়নগরের রাজারা নির্মাণ করান। বিজয়নগর রাজ্যের স্থাপত্যের নিদর্শন মন্দিরে রয়েছে। মন্দির ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরি। মন্দিরটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে নন্দী মণ্ডপ। শিলালিপি থেকে জানা যায় এটি তৈরি করান অনভেমা রেড্ডি নামে এক রাজা। এখানে বহু শিবভক্ত বীর নিজেদের মস্তক স্বেচ্ছায় ভগবান শিবের কাছে উৎসর্গ করতেন দেহান্তে শিব রূপ পাবার জন্য। দ্বিতীয় মণ্ডপের নাম মুখমণ্ডপ বা নাটমণ্ডপ। এটি তৈরি করান বিজয়নগর রাজ্যের রাজা হরিহর রায়। এই মণ্ডপগুলি পাথরে অলংকৃত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাটমণ্ডপের সামনে পূর্বদ্বারি গর্ভ মন্দির। রুপো দ্বারা নির্মিত ছোট্ট দরজার ওপাশে নন্দী ও ভৃঙ্গির দারোয়ানবেশের মূর্তি। রুপোর চৌকাঠের মাথায় পূর্ণঘট ও তার উপর একটি দেবী মূর্তি পদ্মকোরক হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। দরজার বামদিকে ছোটো একটি ঘরে রয়েছে গণেশের মূর্তি। আর মন্দিরের মধ্যে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি নটরাজ মূর্তি : মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ। এই জ্যোতির্লিঙ্গ ২৫ সেন্টিমিটার উঁচু আর লিঙ্গের পিছনে রয়েছে রুপোর আস্তরণে খোদাই করা পর্বতের ছবি। একটি গৌরীপট্ট লিঙ্গকে চতুষ্কোণ আকারে বেষ্টন করে উত্তর দিকে লম্বালম্বি দুটি ধারায় বেরিয়ে গিয়েছে।

এই শ্রীশৈলম পাহাড়ের নীচেই অবস্থিত ৫১ সতীপীঠের একটি পীঠ। মায়ের চিবুক পড়েছিল এই শ্রীশৈলম পর্বতের পাদদেশে, কৃষ্ণা নদীর তীরে। সেখানেই তৈরি হয়েছে মায়ের মন্দির। দেবীর নাম ভ্রামরী বা ভ্রমরম্বা। এখানে ভৈরব হিসেবে বিরাজ করছেন শ্রীমল্লিকার্জুন।

শ্রীশৈলম পর্বতের পাশ দিয়েই চলে গেছে কৃষ্ণা নদী। এই নদী এখানে গঙ্গামাতার মতো পবিত্র। এখানে কৃষ্ণা নদী ১০০ মিটার চওড়া আর পাহাড়ের চূড়া থেকে পাকদণ্ডী পথ বেয়ে সোজা নেমে এসেছে। এখানে এই নদী পাতালগঙ্গা নামে পরিচিত। তিন দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে শ্রীশৈলম পর্বতকে। নদী এখানে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪৭৬ মিটার উচ্চ। সুপ্রাচীনকালে এখানে গভীর জঙ্গল এবং কলাগাছের বন ছিল। সেই বনের মধ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীমল্লিকার্জুন এবং দেবী ভ্রমরাম্বা। জ্যোতির্লিঙ্গ এবং দেবীর রক্ষক ছিলেন এই অঞ্চলের চেঞ্চু বনবাসীরা।

নানা স্থানের প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর আমলে শ্রীশৈলম পর্বত তাঁর রাজ্য সীমার মধ্যে ছিল। সাতবাহন বংশে মাল্লা সাতকর্ণী নামে এক রাজা ছিলেন। মল্লিকার্জুনের আদি নাম মাল্লানা থেকেই এই নাম নেওয়া হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে আসেন ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজারা। এরপর এই স্থান শাসন করেন পহ্লব-কদম্ব বংশ এবং বিষ্ণুকুণ্ডী বংশ। এই সকল বংশের রাজারা ছিলেন শিবভক্ত। এদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব কমে গিয়ে সনাতন ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। বৌদ্ধ তীর্থ নাগার্জুনকোণ্ডার প্রতাপ কমে গিয়ে একই পাহাড়ের অন্য অংশে অবস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আচার্য শঙ্কর তাঁর পরিব্রাজক জীবনে সশিষ্য এখানে এসেছিলেন এবং কাপালিকদের পরাভূত করে তিনি এখানেই তাঁর বিখ্যাত শিবানন্দ লহরী স্তোত্র এবং শ্রীভ্রমরাম্বিকা অষ্টক স্তোত্র রচনা করেন। পরবর্তীকালে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট বংশের আমলে শ্রীশৈলম পর্বতে ওঠার চারটি দ্বারের কথা জানা যায়। আজও সেই চারটি রাস্তায় শ্রীশৈলম পর্বতে ওঠার প্রধান পথ-পূর্বদিকে ত্রিপুরান্তক, দক্ষিণে পুষ্পগিরি,পশ্চিমে আলামপুরা এবং উত্তরে উমা মহেশ্বর। এরপর এখানে শাসন করেন কাকতীয় বংশের রাজারা। বিজয়নগর রাজ্যের রাজা হরিহর রায় সম্ভবত বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ করান। বিজয় নগরের বিখ্যাত রাজা শ্রীকৃষ্ণদেব রায় ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে আসেন এবং মন্দির প্রবেশের প্রধান রাস্তার দু’পাশে দুটি সুন্দর মণ্ডপ তৈরি করান। এখনও সেই মণ্ডপগুলি রয়েছে। এছাড়াও তিনি মন্দিরে সোনার তৈরি নন্দীর ও ভৃঙ্গীর মূর্তি, সোনার শৃঙ্গা, রুপোর তৈরি মল্লিকার্জুনের বেদী জ্যোতির্লিঙ্গের উত্তর দিকে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অন্যপাশে পাথরের একটি মণ্ডপে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মূর্তিও ওই সময়ের তৈরি।

বিজয়নগরের পতনের পর মুসলমান আমলে এই তীর্থ কিছুটা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। তবে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী এই তীর্থ পরিদর্শনে আসেন এবং জ্যোতির্লিঙ্গ ও দেবীর পূজা চালু করার ব্যবস্থা করেন। মন্দিরের প্রধান প্রাচীরের উত্তর দ্বারটি তিনিই তৈরি করে দেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ আমলের শুরুতে হায়দরাবাদের নিজাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে কুড়ুনুল জেলা তুলে দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেজর মনরো তখন এই মন্দিরের ভার এখানকার বিখ্যাত শৈব মঠ পুষ্পগিরি মঠের হাতে তুলে দেন। আজ পর্যন্ত ওই মঠই জ্যোতির্লিঙ্গ ও দেবীর সেবা পরিচালনা করে আসছে। তবে আয়-ব্যয় দেখাশোনার জন্য সরকারি পরিচালনায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে থেকেই সরকারি পরিচালনা আরম্ভ হয়।

আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল সেই জ্যোতির্লিঙ্গকে। বিকৃত সেই জ্যোতির্লিঙ্গ তখন থেকে বিকৃতাক্ষ নামে পরিচিত। দেবী ভ্রামরী বা ভ্রমরাম্বার, ভৈরব বিকৃতাক্ষ। শিবরাত্রির সময় এখানে বিশাল মেলা বসে।

পুরাণাদিতে এই মল্লিকার্জুন শিবলিঙ্গ এবং তীর্থক্ষেত্রের অতীব মহিমা বর্ণিত আছে। এই শিবলিঙ্গের দর্শন, পূজা ও অর্চনা করলে ভক্তগণের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়। দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন থেকে ভক্তগণ মুক্ত হন।

সর্বসুগন্ধিসুলেপিত লিঙ্গং
বুদ্ধিবিবর্ধিতকারণ লিঙ্গং

সিদ্ধসুরাসুরবন্দিত লিঙ্গং তৎ প্রণমামি
সদা শিবলিঙ্গং। □

মিসিং লিংক

ইতিহাস বদলে দিতে পারে সিনাউলির রথ

সন্দীপ চক্রবর্তী

সালটা ২০১৮। এই বছর আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উত্তরপ্রদেশের বাগপতের কাছে সিনাউলিতে খনন চালিয়ে উদ্ধার করলেন পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এক সমাধিক্ষেত্র। পাওয়া গেল ১১৬টি নরকঙ্কাল। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী সমাধিক্ষেত্রটি খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৯০০-র মধ্যবর্তী সময়ের। সব থেকে বড়ো কথা এত বড়ো সমাধিক্ষেত্র এশিয়ার অন্য কোথাও এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

তবে শুধুমাত্র প্রাচীনত্ব দিয়ে সিনাউলিকে বিচার করলে চলবে না। পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে এই বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্রটি যোদ্ধাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। নারী ও পুরুষ দু'রকম যোদ্ধার শব স্থান পেয়েছে এখানে। আশ্চর্যের বিষয় হলো পুরুষ যোদ্ধাদের কঙ্কাল অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেও মহিলা যোদ্ধাদের সকলের কঙ্কাল পা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর কারণ এখনও অজানা। একটি প্রশ্ন এখানে সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। সিনাউলিতে একসঙ্গে শতাধিক যোদ্ধাকে সমাধিস্থ করার কী কারণ থাকতে পারে? অনেকে এই প্রশ্নও করতে পারেন যে এই সমাধিক্ষেত্র কি কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। তবে নীলেশ ওকের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ২৫০০-২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাদের মধ্যে। অর্থাৎ সিনাউলির সমাধিক্ষেত্র তৈরি হবার ৪০০ বছর আগেই হয়ে গিয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধ। সুতরাং প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে সিনাউলির সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে সিনাউলির একটি বৈশিষ্ট্য এমনই যা যুদ্ধক্ষেত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এখানকার একাধিক সমাধিতে পাওয়া গেছে রথ। এবং সেই রথ যে ঘোড়ায় টানা রথ— তারও প্রমাণ

দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে সরস্বতী-সিন্ধু সভ্যতার প্রায় ২০০০ কেন্দ্রে কোথাও রথ পাওয়া যায়নি। যার ফলে আর্য আক্রমণ (অথবা অভিবাসন) তত্ত্বের অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আর্য নামের এক মানবগোষ্ঠী ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করে। তারা এখানকার অসভ্য ও অশিক্ষিত আদি বাসিন্দাদের (যারা হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, রাখিগড়ির মতো নগর নির্মাণ করেছিল) যুদ্ধে হারিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলে। আর্যরা ছিল শিক্ষিত। কালক্রমে তারা বৈদিক সংস্কৃতির পত্তন ঘটিয়েছিল। সব থেকে বড়ো কথা আর্যরা ছিল মারাত্মক যোদ্ধা। আর্যরা আসার আগে এ দেশের কেউ ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। কিন্তু সিনাউলিতে আবিষ্কৃত রথ আর্যতত্ত্বে জল ঢেলে দিয়েছে। প্রমাণ হয়ে গেছে তথাকথিত আর্য আক্রমণের অন্তত ৬০০ বছর আগে থেকেই এদেশের লোক ঘোড়া ও রথের ব্যবহার জানত।

সিলাউলির রথ দেখতে কেমন, এটা একটা খুবই জরুরি প্রশ্ন। জরুরি তার কারণ ২১০০-১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত রথের নিদর্শন আমরা মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট ও গ্রিসেও পেয়েছি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন সিনাউলির রথ অন্য যে কোনও সভ্যতার রথের থেকে কারিগরি এবং যাত্রী সাচ্ছন্দ্যের নিরিখে এগিয়ে। সিনাউলির রথে একটি উল্লম্ব খুঁটি দেখতে পাওয়া যায়, চলন্ত রথে যাত্রীদের শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। তবে এই রথের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর চাকা। ২০১৮ সাল থেকে লাগাতার চেষ্টা করার পর অবশেষে জানা গেছে নিরেট কাঠ দিয়ে তৈরি সিনাউলির রথের চাকা। চাকার গায়ে অনেকগুলো ত্রিভুজাকৃতি তামার চাকতি রয়েছে। হঠাৎ দেখলে স্পোক বলে মনে হয় কিন্তু আদতে তা নয়। তামার চাকতি লাগানো হয়েছিল চাকাকে দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য। নেহাতই অলংকরণের উদ্দেশ্যে চাকায় তামা লাগানো হয়নি।

প্রাচীন ইজিপ্টের মানুষ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত। যার ফলে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের উপযোগী প্রচুর জিনিসপত্র পিরামিডগুলোতে পাওয়া গেছে। মৃত ব্যক্তির

ফঃ ৫

দরকার লাগবে— এই ভাবনা থেকেই সমাধিতে এসব দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো সিনাউলির প্রতিটি সমাধিতে মিলেছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, মাটি ও তামার জিনিসপত্র। এই আবিষ্কার থেকে প্রমাণ হয় সিনাউলির এই সমাধিক্ষেত্র হরপ্পার সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বরং বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সিনাউলির মিল আছে।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৫ নং সূক্তে বলা হয়েছে মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার দু'ভাবে হতে পারে। মাটির নীচে সমাধিস্থ করে, একে বলা হয় অনগ্নিদগ্ধ আর চিরাচরিত প্রথায় দাহ (অগ্নিদগ্ধ) করে। কফিনবন্দি মৃতদেহ মাটির নীচে রাখার পর তার ওপর সমাধিগৃহ নির্মাণ করার বিধান আছে ঋগ্‌বেদে। এই গৃহে থাকবে মৃতব্যক্তির ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্র। থাকবে ঘি ও মধুও। ঋগ্‌বেদের এই বর্ণনা সিনাউলির সমাধিক্ষেত্রের সঙ্গে মিলে যায়। এখানে প্রচুর মাটির পাত্র পাওয়া গেছে যা সম্ভবত ঘি, মাখন ও ওষুধ রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তে মৃতের হাত থেকে তিরধনুক নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সিনাউলির যোদ্ধাদের সমাধিতে এরকম তিরধনুক পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে যোদ্ধার ব্যবহৃত ঢাল, তলোয়ার ইত্যাদি। এমনকী যোদ্ধার জীবিত অবস্থায় ব্যবহার করা রথটিও স্থান পেয়েছে সমাধিগৃহে।

বৈদিক সংস্কৃতির আর একটি নমুনা দেখা যেতে পারে। সিনাউলিতে একটি বিশেষ সমাধিতে পাওয়া গেছে দুটি রথ। সম্ভবত এটি কোনও রাজা বা গোষ্ঠীপতির সমাধি। কিন্তু প্রশ্ন হলো দুটি রথ কেন? কারণ ঋগ্‌বেদ অনুসারে পোড়া রথ যম ও তাঁর বোন যমীর প্রতীক। বৈদিক সূক্ত অনুযায়ী, মাটির একটি স্তূপ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পাঁচটি ধাপ (পঞ্চ পাদানি) অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছনো যায়। স্তূপের মধ্যে থাকবে একটি গভীর গর্ত। যার মধ্যে থাকবে চার পায়া বিশিষ্ট একটি খাট। এই খাটের ওপর শোয়ানো হয় মৃতদেহ। সিনাউলির প্রতিটি সমাধিতে এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এই নিবন্ধের শুরুতে বলেছি সিনাউলির এই সমাধিক্ষেত্র মহাভারতের যুদ্ধের অনেক আগে তৈরি হয়েছিল। তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে যদি অশোক ভাটনগরের মত মেনে নেওয়া হয় তাহলেও দুটি ঘটনার সময় মেলে না। অশোক ভাটনগরের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়াও সে সময় আরও অনেক যুদ্ধ হয়েছিল যার প্রমাণ ঋগ্‌বেদের প্রথম, পঞ্চম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলে হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর যুদ্ধজয়ের কথা বলা হয়েছে, যার সময় ১৯৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ধরা যেতে পারে। শান্তনু ছিলেন ভারতবংশের কনিষ্ঠতম রাজা এবং পাণ্ডব ও কৌরবদের পূর্বপুরুষ।

সব শেষে একটি জরুরি প্রশ্ন। প্রাচীন ভারতের মহিলারা কি যুদ্ধে অংশ নিতেন? সিনাউলির মহিলা যোদ্ধাদের সমাধি থেকেই এই প্রশ্ন উঠে আসছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল পুরুষদের যুদ্ধ। কিন্তু দেবী ভগবত ও স্কন্দপুরাণে মহিলা যোদ্ধাদের উল্লেখ আছে। রামায়ণ বলছে কৈকেয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে দশরথের রথের সারথি ছিলেন। মহাভারতের হরিবংশে আছে, কৃষ্ণের সঙ্গে যখন নরকাসুরের যুদ্ধ চলছিল তখন তাকে সাহায্য করেছিলেন সত্যভামা। দ্রৌপদীও অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সুতরাং প্রাচীনকালে মহিলারা যুদ্ধবিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, একথা বলা যাবে না।

সিনাউলি এক কথায় আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। রথের আবিষ্কার প্রমাণ করে প্রাচীন ভারত ঘোড়ার ব্যবহার জানত। সুতরাং আর্যরা ঘোড়া এনেছিল এই তত্ত্ব আর বেশিদিন চলবে না। সব থেকে বড়ো কথা বৈদিক সংস্কৃতি ও হরপ্পা সংস্কৃতি যে একে অন্যের পরিপূরক— আমাদের ভাবনাকে সেই পথে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রেও সিনাউলি একটি মাইলফলক। □

With Best Compliments
from -

SHIV RATAN BAGARIA

রাষ্ট্র পুনর্গঠনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রশক্তির ভূমিকা

কারও ধার করা চিন্তা নয়, চিন্তা চুরি করে নয়। স্বাধীন চিন্তাধারা না এলে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হবে না।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গৃহে যেমন একটি ঠাকুরঘর থাকে। বিশ্বরূপ গৃহেও একটি ঠাকুরঘর আছে। সেই উপাসনা-কক্ষটি হচ্ছে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। সাধুসন্তের দেশ বলে পুণ্যভূমি, মহন্ত-মনীষীর দেশ বলে এই দেশে সৌকর্যভূমি। ভারতবর্ষ দর্শনের দেশ, প্রজ্ঞা ও বোধাতীতানন্দের দেশ। এই ঠাকুরঘরের দেশ বাঁচলে বিশ্ব বাঁচবে। তাই অবিলম্বে এর পুনর্গঠন দরকার।

পুনর্গঠন দরকার তার কারণ সিস্টার নিবেদিতার মতে, ভারতবর্ষ না বাঁচলে বিশ্ব এক অমূল্য রতন হারাবে। ভারতবর্ষের মঙ্গলই বিশ্বের মঙ্গল। কারা পুনর্গঠন করবেন? ছাত্রসমাজ। কেন ছাত্রসমাজ? কারণ তারা 'সুবজ', তারা 'কাঁচা'। তারা 'আধমরাদের ঘা মেরে' বাঁচায়। কোন ছাত্রসমাজ? জাতীয়তাবাদী গৈরিক ছাত্র সমাজ। কারণ ভারতবর্ষ মোক্ষের দেশ, তার স্বরূপ হচ্ছে গেরুয়া। তার পতাকা, তার মাস্তুল গৈরিক বর্ণ। জাতীয়তাবাদ এ কারণেই, তার হেডকোয়ার্টার থাকতে হবে ভারতবর্ষের মস্তিষ্কের মধ্যেই, ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডের মধ্যেই। রাশিয়ায় নয়, চীনে নয়, কোরিয়ায় নয়, কিউবায় নয়। ভারতবর্ষের প্রাণভোমরা ভারতের মধ্যেই আছে, ভারতবর্ষের মধ্যেই থাকতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদ দিয়ে একাজ হবে না। কেন হবে না? একটি মেঠো কথা হলো, 'আগে দিয়ে বেড়া/তবে ধরো গছের গোড়া।' আগে দেশের চারপাশে বেড়া দিয়ে দেশ সুরক্ষিত করতে হবে, দেশের সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে, তারপর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' করতে হবে। ভারতবর্ষ নিজে আগে বাঁচবে, তবে না বাঁচাবে!

অর্থাৎ দাঁড়ালো এই, ভারতরাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য জাতীয়তাবাদী গৈরিক ছাত্রশক্তির প্রাসঙ্গিকতা আছে। সেটা কোন পথে কোন উদ্যোগে হবে তারই সুলুকসন্ধানের জন্য এই আলোচনা।

একটি সমৃদ্ধিশালী আদর্শের দিকে এগিয়ে যেতেই তো আমরা চাই। বর্তমান প্রজন্মকে কুপ্রথামুক্ত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার সংকল্পে এগিয়ে যেতে চাই। ছাত্রাবস্থা থেকে একটি হিতবাদী দৃষ্টান্ত

স্থাপন আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিকে কাজে পরিণত করতে চাই, বলতে চাই, Bandemataram in Action। কোন মায়ের বন্দনা? সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং ভারতমাতার বন্দনা। হাজার হাজার বিদ্যার্থী নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি 'ভারতমাতা'র জয়ধ্বনি করে ভারতমাতার কাজে শামিল হোক। কেরল থেকে কাশ্মীর, অরুণাচল প্রদেশ থেকে গুজরাট— সমগ্র ভারত জুড়ে তাদের ভূমিকা এবং সার্থকতা গড়ে উঠুক। শুভঙ্করী ও সুন্দরের পথে যেতে কোনো বাধা না মানার ঐতিহ্য, আন্দোলন না থামার পরম্পরা গড়ে উঠুক।

'Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice.' কার ঐশ্বর্যশালিনী হবার কথা বলা হচ্ছে? দেশমাতার। কার আনন্দ লাভের কথা হচ্ছে? ভারতমাতার। কে বলছেন? —শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তখন তিনি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ১৯০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে উত্তাল ভারতবর্ষ। বহু টাকার বেতন ছেড়ে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করতে এলেন। বিলেত থেকে পড়াশোনা করা তরতাজা এক যুবক।

তিনি ছাত্রদের বলছেন, পড়াশোনা করবে দেশের জন্য। If you will study, study for her sake. শরীর, মন, অন্তরাত্মাকে উপযুক্ত করবে দেশসেবার জন্য। train yourselves body and mind and soul for her Service. You will earn your living that you may live for her sake. দেশের জন্য বেঁচে থাকতে আয় করবে। বিদেশে যাবে যাতে সেখান থেকে জ্ঞান নিয়ে এসে দেশের সেবায় লাগাতে পার। You will go abroad to foreign lands that you may bring back knowledge with which you may do service to her.

দু' বছর বাদে ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 'Service of our motherland is our highest duty at this moment.' মাতৃভূমির সেবাই এই সময়ে আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও একই মত ছিল, 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ নয়।'

কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক, হিন্দু কেমিস্ট্রি গ্রন্থ প্রণেতা। যিনি স্বামী প্রণবানন্দকে সঙ্গী করে পূর্ববঙ্গে গিয়ে ছাত্রদের নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকার্য সংগঠিত করেছেন। ১৯২৫ সাল, যে বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, সে বছর ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির এক অধিবেশনে বলছেন, 'আমি বরাবরই বলে থাকি দেশের ছাত্রদের এবং যুবকদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করবেন তা হলে সহজে তা করতে পারেন। যেটুকু শিখেছেন তা দেশের লোকের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। তাঁরাই আমাদের দেশের বহুকালের প্রচলিত বাক্য 'বিদ্যা মহাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে/যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

জাতীয়তাবাদী ছাত্রশক্তির কাজ কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা, বাহুবল, মিথ্যাপ্রচার, স্লোগান, পরনির্ভরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। তা পরিশ্রম, নিষ্ঠা, কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে মুছে ফেলতে যেখানে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অশুভ শক্ত, দেশদ্রোহী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তার বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে হয়। তাদের হিংসামূলক কাজের সম্ভাবনা জরিপ করতে হয়। বাহুবল নয়, ভালোবাসা দিয়ে জাতীয়তাবোধের আদর্শে সদস্যতা করতে হয়। তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনন্দধারায় বাঁধতে হয়। এ বাঁধন বিহীন বন্ধন। দেশমাতৃকা তার জপমন্ত্র।

ভারতবাসীকে, বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিতে হবে ছাত্রশক্তি কোনো অসভ্যতার পৃষ্ঠপোষক নয়, Student Power Nuisance power নয়। বোঝানোর দরকার আছে ছাত্ররা অনেকানেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের দ্বারা পোষা গুন্ডার দল নয়। নিকট অতীতের আমরা সাক্ষী যে ছাত্রদের অসীম জীবনীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে শাসক দল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ছাত্ররা সেই রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে থাকে, পদলেহন করে। বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করে যারা বিদ্যার্থীদের বিভ্রান্ত করে, তারা ছাত্রদের জন্য সম্পদ নয়। দেশের ক্ষতি করে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলে বিদেশি হেডকোয়ার্টারের সমৃদ্ধি চায় এবং ছাত্রদের লেলিয়ে দেয়, তাদের চিহ্নিত করতে পারা, ছাত্রশক্তির প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত। সজাগ থাকতে হবে কোন দল, কোন আদর্শ ছাত্রদের বিপথগামী করে তুলছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশবিরোধী, সমাজবিরোধী মানুষের মদত দেওয়ার নামই হলো অনৈতিকতা। ছাত্রদের সঠিক আদর্শ, সঠিক দিশার প্রতি নাড়া বাঁধতে হয়। ইতিবাচক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা, ভারতমায়ের গৌরববর্ধনের জন্য সদাসক্রিয় হওয়ার নামই জাতীয়তা।

এক সময় ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল ছাত্রশক্তি। আজ সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার নামই হলো জাতীয়তা। ছাত্রদের উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে লেলিয়ে দিয়ে স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া সহজ। তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয় যে ল্যাবরেটরি, গবেষণা খামার, ক্লাসরুম; তা হঠকারী আন্দোলনের নামে ভেঙে যেতে দেখেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। তারা ভেঙে, গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইজমে বিশ্বাসী। হ্যাঁ, ভাঙনের জয়গান গাইতে চেয়েছিলেন কবি, সেটা কোন ভাঙন? সেটা অশুভ মানসিকতার ভাঙন, সেটা ধ্বংসাত্মক শক্তির ভাঙন, সেটা দেশবিরোধিতার ভাঙন, সেটা বিকৃত সংস্কৃতির ভাঙন। ছাত্রশক্তিকে যাবতীয় গড়ার কাজ করতে হবে। শুভঙ্করী মূল্যবোধ গড়ার কাজ, জনসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ, জ্ঞান-মানস গড়ে তোলার কাজ, চরিত্র গঠনের কাজ, একতা গড়ে তোলার কাজ। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে জ্ঞান-চরিত্র-একতার গঠনপথ ভীষণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে। গঠন সর্বস্তরে চাই এবং গঠনের পর তা যাতে কোনো শক্তি ভাঙতে না সাহস পায়, তার জন্যও শক্তি-সংহতির কাজ করবে রাষ্ট্রবাদী ছাত্রশক্তি।

নতুন ভারত গঠনে যেমন ছাত্রদের ভূমিকা থাকবে, তেমন শিক্ষকদেরও যথাযথ ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকবে। ছাত্রদের ভাবজগতে গঠনমূলক পরিবর্তন আনার উসকো কাঠি হবেন শিক্ষকেরা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অন্তরে-বাহিরে জাতীয়তাবাদী শিক্ষককে খোঁজার পথ জনতে হবে ছাত্রদের। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন তার সুলুকসন্ধান দিতে পারে। বিদ্যায়তনে শিক্ষকেরা পাঠদান করেন, এটা সত্য, কিন্তু সেটাই শেষ নয়, অনুপ্রেরণা দান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের কেবল ডিগ্রি লাভ নয়, 'বিকশিত' হয়ে ওঠার শিক্ষা ছাত্রজীবনের বড়ো পাওনা, বড়ো সার্টিফিকেট। কোন বিকাশ? বিকাশ মানে হলো

প্রসারণ, বিকাশ মানে হলো বিস্তৃতি। মনের প্রসারণ। বড়ো মনের মানুষ হতে হবে। একসঙ্গে বাঁচা আর একসঙ্গে লড়ার সামর্থ্য জন্মাতে হবে। ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে। ব্যক্তিত্বের উত্তরণে শিক্ষক যোগ্য সহায়তা করবেন।

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের রাষ্ট্রভক্তিতে পরিপূর্ণ হতে হবে। ভারত ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা। সমান সুখ-দুঃখের ভাবনায় গঠিত সমাজ। এক জীবনদর্শন, এক গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি, প্রাচীন আধ্যাত্মিক পরম্পরা। ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রাণশক্তির এক উচ্ছল ধারা তার মধ্যে থাকবে। আমাদের প্রার্থনা হতে পারে কবি কুসুম কুমারী দাশের ভাষায়, 'আদর্শ ছেলে' কবিতার মতো—

> আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
> কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে?
> মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
> 'মানুষ হইতে হবে'— এই যার পণ।
> বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান
> নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
> হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়?
> চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?
> সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
> আসে যার চোখেজল, মাথা ঘুরে যায়?
> মনে প্রাণে খাট সবে, শক্তি কর দান,
> তোমরা 'মানুষ' হলে দেশের কল্যাণ।

কেমন মানুষ হবে তারা? আর কীভাবে দেশের কল্যাণ হবে? জাতীয় আদর্শে প্রতিপালনের মাধ্যমে কল্যাণ হবে। ত্যাগ আর সেবা হলো ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ। 'ত্যাগ' কাকে বলে? ত্যাগ মানে হচ্ছে 'কাঁচা আমি' থেকে 'পাকা আমি'-তে চলে যাওয়া। ছোটো আমি থেকে বড়ো আমিতে রূপান্তরিত হওয়া।

মানুষের দ্বারা মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস তো অনেক দিন হলো। ওই পথে ভারতের মুক্তি নেই, মুক্তি হতেও পারে না। বলা হয়, 'একান্তে সাধনা/লোকান্তে পরোপকার'। পরোপকারের জন্যই সেবা। মানুষের কাজ। দেশের মানুষের জন্য কাজ। সেবা কাকে বলে? সেবা হলো পীড়িত মানুষকে ভালো রাখার সুযোগ পাওয়া। কেউ সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন বলেই সেবা করতে পারছি, এই বোধটি থাকা দরকার। নইলে সেবা হবে না। সেবাপ্রাপ্ত মানুষের কাছ থেকেই সেবার কাজ চেয়ে নিতে হয়। যতক্ষণ মনে হবে আমি কাজ করছি বলেই তিনি পরিষেবা পাচ্ছেন, ততক্ষণ সেবার কাজ হবে না। নিজেদের মোক্ষের জন্যই যে হিতসাধন তা ছাত্রাবস্থা থেকে বুঝতে পারার নামই সেবাধর্ম। করোনা পরিস্থিতিতে নানান সেবাব্রতীর সঙ্গে অতুল সামর্থ্যে সেবাকাজ পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রসমাজ। এবিভিপির কাজ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এটা নিয়ম মেনে, নিজেকে রক্ষা করেই করতে হবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। জীবনের সকল কাজে পরিচ্ছন্নতা। জৈবিক ক্ষতি করে সেখানে কীটনাশক ব্যবহার না করার স্বচ্ছতা। জাতীয়তাবাদী কাজ এটাও, ন্যাচারাল ফার্মিঙে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ। কারণ বহু ছাত্রদের নিবাস গ্রামে। সামগ্রিক গ্রাম বিকাশে হাত লাগানোর মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা থরে বিথরে ছড়িয়ে আছে। 'গ্রামে চলো' ধ্বনি উঠুক ছাত্র সমাজ থেকে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রেরা দাবি তুলুক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে কৃষি, পশুপালন ও পরিবেশ শিক্ষা দেওয়া হোক। কলা বা বিজ্ঞানের একজন পিএইচডি স্কলার যখন টবে একটি গাছ লাগাতে অসমর্থ হন, ফুল ফোটাতে পারেন না, তখন তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলে ধরে নিতে হবে। প্রকৃতি ও বাস্তবমুখী শিক্ষা জোর করে ছিনিয়ে নিক ছাত্রসমাজ। নীতিশিক্ষা, শারীরশিক্ষার দাবি জোরদার হোক। তবেই বুঝবো ছাত্র বটে।

বিশ্ব এখন গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষেরও গভীর সংকট। ভারতের বাজারে চীনের দখলদারি, সীমান্তে তাদের নানান অনৈতিক কাজ। ভারতবর্ষের মধ্যে নানান সংগঠন ও ব্যক্তির মধ্যে চীন-মানসিকতা গেড়ে বসে আছে। আমাদের উচিত হবে চীনা জিনিস নয়, দেশীয় জিনিসে সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাওয়া। ছাত্রসমাজ এই স্বদেশী জাগরণের কাজটি করতে পারে। মানুষকে বোঝাতে পারে। কোন কোন জিনিস বিদেশি, চীন দেশে তৈরি, কোনটি দেশীয় পণ্য, তা সহজভাবে মানুষের কাছে পরিবেশন করতে হবে। চীনের পণ্য ও চীন-মানসিকতা বয়কট করার কাজও একটি রাষ্ট্রবাদী কাজ হবে। স্বদেশি জাগরণ ও আত্মনির্ভরশীল ভারত নির্মাণের কারিগর হতে পারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রসমাজ। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বদেশি আন্দোলনের কথা মনে পড়বে।

১৯০৮ সালের ২৬ জানুয়ারি একটি সভায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'There are four subjects which usually form the subject matter of a Nationalist's speech. They are, first Swadeshi, second, boycott. third, Swaraj, and fouth, national education.' বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণে তিনি বললেন, 'Swadeshi, Boycott, National Education– these are the three planks upon which all can take their stand.' আমরা ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার স্বদেশি আন্দোলনে দেশজুড়ে শামিল হয়েছি। এই আন্দোলন আর্থিক স্বনির্ভরতার আন্দোলন। এ লড়াই গ্রাম-ভারত নির্মাণের লড়াই। এ মহারণ দেশের পণ্য ভারতভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়ার যুদ্ধ। ছাত্রসমাজকে তাতে শামিল হতেই হবে।

যদি পড়াশোনা করে মূল্যবোধ তৈরি না হয়; যদি নির্ভীক, স্বাভিমানী, স্বাবলম্বী হতে না পারে, সেবাপরায়ণ, দেশভক্ত ভারতীয় নাগরিক হয়ে না উঠতে পারে, তবে সে শিক্ষা বৃথা। রাষ্ট্রবাদী ছাত্রসমাজ এমন শিক্ষা অর্জনের জন্য তদ্বির করবে যা জীবনের সমস্যাকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে সক্ষম হয়। ছাত্র কেবল নিজে শিখবে না, অধীতজ্ঞান গৃহে, গ্রামে, গঞ্জে সফলভাবে যথাসাধ্য প্রয়োগ করবে। নীতিনিষ্ঠ সমাজ তৈরি করতে এগিয়ে আসবে। রাষ্ট্র-জীবনকে গৌরবশালী করবে। স্বধর্ম রক্ষা করবে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। স্বদেশ অভিমান জাগ্রত করবে। এই কাজে শিক্ষক ছাত্রকে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

'ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ/ তেজস্বীনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।/ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।' আমরা শিক্ষক-ছাত্র সমভাবে বিদ্যার্জন করব, সমভাবে বিদ্যার ফল লাভ করব; সকলে সুস্থ-সুবল নীরোগ জীবনযাপন করব; কেউ কারও প্রতি বিদ্বেষী হব না; আমাদের মধ্যে সকল সুখ-শান্তি বিরাজিত হোক।

বিদ্যাগার থেকে পূর্ণ মানুষ হয়ে বেরোতে হবে, নিজেকে অবিরত চিনে, নিজেকে জেনে, নিজের চিন্তা চেতনাকে উপলব্ধি করে। তবেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীকে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারব। কারও ধার করা চিন্তা নয়, চিন্তা চুরি করে নয়। স্বাধীন চিন্তাধারা না এলে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হবে না। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে যা মণিমাণিক্য খুঁজে পেলাম তাকে জীবনের প্রয়োজনে আনতে হবে; সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে হবে। □

অতিথি সেবা

বিষ্ণুকাঞ্চী নগরে দামোদর নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বিয়ের পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, দেখো আমরা এখন গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেছি। এখন আমাদের প্রধান কাজ অতিথি নারায়ণের সেবা করা। আমি ঘরে থাকি বা না থাকি কোনো অতিথি যেন না খেয়ে ফিরে না যায়। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম হলো গুরুর আদেশ পালন করা, বাণপ্রস্থীর ধর্ম হলো তপস্যা করা, সন্ন্যাসীর ধর্ম হলো ভগবৎ চিন্তা ও সাধন-ভজন করা। তাঁর স্ত্রী বলল ঠিক আছে। এই ব্রাহ্মণ কাঞ্চীনগরীর পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতেন এবং তাতে যা পেতেন তাই ঘরে এনে স্ত্রীকে দিয়ে দিতেন। আগে কোনো অতিথি ও পশুপক্ষীকে দিয়ে যা থাকত তাই তারা খেতেন। কিন্তু কোনো কোনো দিন ভিক্ষা জুটত না। সেদিন তারা জল খেয়েই থাকতেন।

একদিন ভগবান তাদের পরীক্ষা করার জন্য এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে তাঁদের কুটিরে এলেন। দামোদরের কুটিরের সামনে এসে বললেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত, একটু খাবার চাই। দামোদর বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, এ তো আনন্দের কথা। আপনি ভেতরে আসুন।

দৈবযোগে ব্রাহ্মণ সেদিন কোনো ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারেননি। তিনি ভাবলেন এখন কী হবে, ঘরে তো কিছুই নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, আজ তো খুবই মুশকিল হলো। অতিথি সেবা কী করে হবে। স্ত্রী বলল, তুমি নাপিতের বাড়ি থেকে একটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে এস। ব্রাহ্মণ কাঁচি নিয়ে এলেন। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী কাঁচি দিয়ে নিজের সুন্দর চুল ভেতরে ভেতরে কেটে ফেলল এবং তা দিয়ে লম্বা একটা দড়ি তৈরি করে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বলল, বাজারে নিয়ে গিয়ে এটি বিক্রি করে কিছু চাল ডান কিনে নিয়ে এস। ব্রাহ্মণ বাজারে গিয়ে সেটা বিক্রি করে চাল ডাল নিয়ে এলেন। তার স্ত্রী তা দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে ডাকলেন। তার স্ত্রী কলাপাতায় খিচুড়ি পরিবেশন করলেন। সন্ন্যাসী একটু একটু করে সবটাই খেয়ে ফেললেন। কিছুই বাকি রইল না। খেয়ে উঠে সন্ন্যাসী বললেন, বিকেল হয়ে এল। আজ আর কোথাও যাব না। এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, এ আমার সৌভাগ্য।

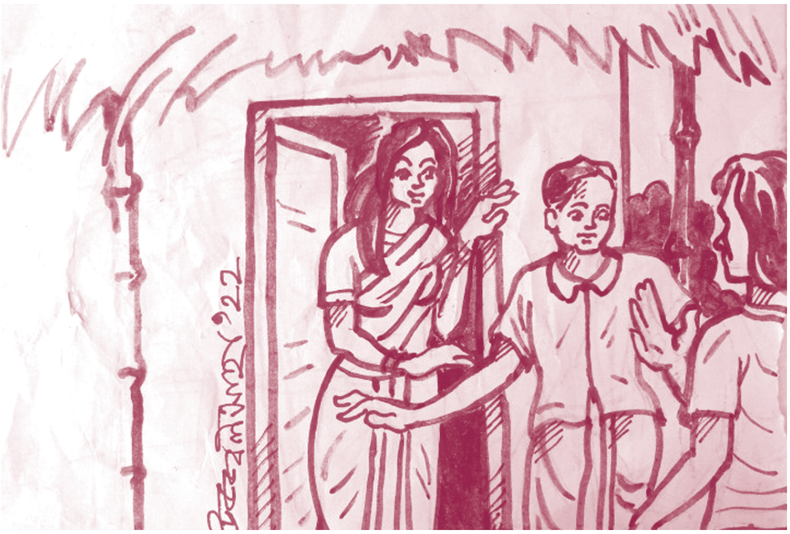

সন্ধেবেলা ব্রাহ্মণের স্ত্রী তার মাথার সব চুল কেটে ফেললেন আর তা দিয়ে আবার দড়ি তৈরি করলেন। ব্রাহ্মণ সেই দড়ি বিক্রি করে আবার চাল আলু কিনে আনলেন। রাতে আলুভাতে রান্না করে সন্ন্যাসীকে খেতে দিলেন। সন্ন্যাসী সব চেটেপুটে খেয়ে নিলেন। তারপর সন্ন্যাসী শুয়ে পড়লে ব্রাহ্মণের স্ত্রী পাখার বাতাস করতে লাগালন এবং ব্রাহ্মণ তার পা টিপে দিতে লাগলেন। একসময় তারাও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়ে পড়তেই সন্ন্যাসী উঠে বসলেন। তিনি ঘুমোননি। তিনি ঘুমের ভান করে শুয়েছিলেন। তারপর তাদের আশীর্বাদ করে অন্তর্ধান করলেন।

ভোরবেলা ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলেন সন্ন্যাসী বিছানায় নেই। সে অবাক হয়ে স্বামীকে ডাকলেন। ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ন্যাসীকে খুঁজতে লাগলেন। তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বললেন, আগে নিজের দিকে দেখ, আমার দিকে দেখ, বাড়িঘরের দিকে দেখ। ব্রাহ্মণ দেখলেন, তার স্ত্রীর মাথায় আগের মতোই চুলে ভর্তি। শরীরে গহনা ভর্তি। তাদের কুঁড়েঘর অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণ তখন সব বুঝতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে ঈশ্বর, আমরা তোমাকে চিনতে পারলাম না। তোমার সেবায় না জানি কত ত্রুটি করে ফেললাম। আমাদের ক্ষমা করুন প্রভু। তখনই দৈববাণী হলো— 'তোমাদের সেবায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। এখন থেকে তেমরা সমস্ত জীবের সেবা কর। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে তোমরা আমার ধামে চলে আসবে।'

গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বিপ্লবী

রজত কুমার সেন

বিপ্লবী রজত সেনের জন্ম ১৯১৩ সালে চট্টগ্রামে। মাস্টারদা সূর্য সেনের ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ওই বছরেরই ৬ মে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে প্রহরীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

জানো কি?

- পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গম্বুজের পতাকা বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে ওড়ে।।
- মন্দিরের মূল গম্বুজটি ৪৫ তলা বাড়ির সমান উঁচু।
- একজন সাধু প্রতিদিন গম্বুজের উপরে উঠে পতাকাটি পরিবর্তন করেন।
- মন্দিরের একেবার উঁচু গম্বুজে সুবিশাল চক্র রয়েছে।
- চক্রটির উচ্চতা ২০ ফুট এবং ওজন ১ টন।
- মন্দিরের ওপর দিয়ে কোনো পাখি বা বিমান চলাচল করতে দেখা যায়নি।

ভালো কথা

রথের মেলা

প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এলেই আমার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। রথযাত্রা মানে রথের সঙ্গে সঙ্গে মেলার মজা। আমাদের বাড়ির পাশে এক অতি পুরনো একটি মন্দির আছে, সেখানে একখানি ছোট রথ রাখা থাকে। গ্রামের সবার উদ্যোগে এক সপ্তাহ আগে থেকে রথ সাজানোর কাজ চলে। তারপর রথযাত্রার দিন পুজো হয়। পুজোরশেষে গ্রামের সকলেই রথের দড়ি ধরে টানতে থাকে। রথের দড়ি স্পর্শ করলে নাকি পুণ্য হয়। আমিও রথের দড়ি ধরে টেনেছি। বিকেলে জমজমাট মেলা বসে। মেলায় অনেক দোকান বসে। হরেক রকম জিনিস কেনাবেচা হয়। তার মধ্যে পাঁপড়, জিলিপি আর ফুচকার নাম না বললেই নয়। এগুলি আমার খুব প্রিয়। রথযাত্রার মেলা মানে বৃষ্টির আনন্দ। বৃষ্টি না হলে কি রথ চলে?

রুদ্রাঙ্কুশ ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণী, ত্রিমোহিনী, দঃ দিনাজপুর

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

রোজনামচা

সাত্ত্বিকা ভট্টাচার্য, অষ্টম শ্রেণী, রাজাপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

আমি থাকি ছোট্ট ঘরে,পাশাপাশি অনেক বাড়ি,
মিলেমিশে থাকি সবাই, নাইকো তেমন আড়াআড়ি
যখন আমি পড়তে বসি, পড়ার নামে খেলতে থাকি
উচ্চশিক্ষার জন্য নাকি দূর রাজ্যে দেবো পাড়ি!
মা আমার গাঁথে মালা, রোজ সকালে উঠে
তাড়াতাড়ি স্নানটি সেরে ফুল খুঁজতে ছোটে।
বাবা আমার ব্যস্ত মানুষ, দিনের বেলা থাকে না ঘরে
সারাটা দিন অফিস সেরে, রাতের বেলায় ফেরে।
দাদার কানে ইয়ারফোন, চায় না কথা শুনতে
সারাটা দিন শুধু পশ্চিমবঙ্গ, খেতে-উঠতে-বসতে।
তবু, সুখে-দুঃখে আছি আমরা চারজনেতে মিলে
পাশাপাশি সবাই থাকি ভুলভ্রান্তি সব ভুলে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

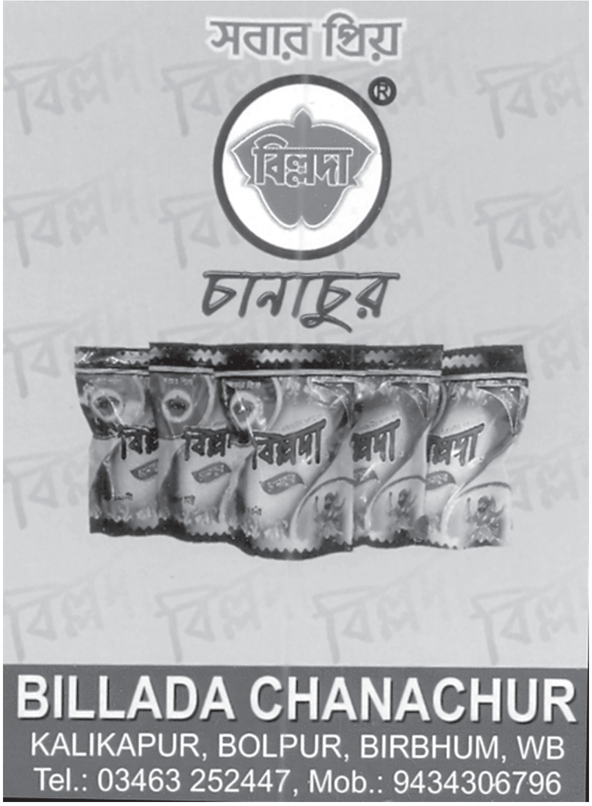

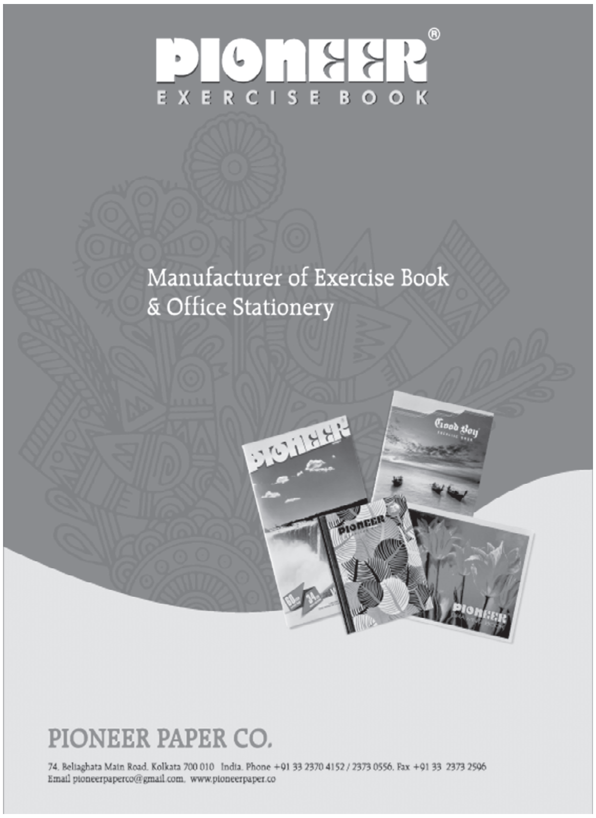

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

প্রথম মহাযুদ্ধে আত্মবলিদান করা ভারতীয় সৈনিকরা আজও অবজ্ঞাত

কৌশিক রায়

শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদের উপনিবেশ হয়ে থাকার অনেক কুফলই ভুগতে হয়েছিল ভারতবর্ষকে। সাগরপারের সামান্য বণিক থেকে ভারত-ভাগ্যবিধাতা' হয়ে ওঠা ইংরেজদের বুলেট, বেয়নেট আর ফাঁসির দড়িতে অজস্র নিরীহ ভারতীয়ের জীবন অকালে নির্বাপিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি আরও একটি অবিচার ভারতের ওপর করেছিল ইংরেজ প্রভুরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গণে প্রায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে নিয়োগ করে ব্রিটিশ মিত্রশক্তি। এই হতভাগ্য সৈনিকদের মধ্যে নিহত হয়েছেন প্রায় ৮০ হাজার সেনানি।

ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাবিহিনীর গোলাবারুদ, রসদ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বহন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রায় দু' লক্ষ ঘোড়া ও খচ্চর। ভারতের মানুষের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তবুও প্রথম মহাসমরে নিহত বিকলাঙ্গ ভারতীয় সৈন্যদের স্মৃতি এবং তাঁদের দুঃস্থ, শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি তেমন কোনও সহানুভূতি দেখায়নি গ্রেট ব্রিটেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের মিডল্যান্ডস জেলাতে অবস্থিত স্মেথউইক শহরের অন্তর্গত হাই স্ট্রিটে প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি লোকদেখানো কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ১০ ফুট লম্বা একটি শিখ সৈনিকের ব্রোঞ্জমূর্তির উদ্বোধন করেছেন পূর্বতন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ভারতীয় সৈনিকদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন টেরেসা। তবে প্রথম মহাযুদ্ধে জীবন বাজি রেখেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেও ব্রাত্য হয়ে থাকা ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি তেমন কোনও সহানুভূতি দেখাননি অন্যান্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা— মার্গারেট থ্যাচার, গর্ডন ব্রাউন, টনি ব্লেয়ার, ডেভিড ক্যামেরুন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। 'White Man's Burden' বা সাদা চামড়ার মানুষদের গলগ্রহ হয়েই চিরকাল অবহেলিত, উপহাসাস্পদ হয়েছেন, ডার্টি নিগর এবং হিদেন হয়ে ব্রিটিশদের

গালি আর জুতো খাওয়া ভারতীয় সেনানীরা। অথচ ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গণে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত প্রভুদের হয়েই কামান, বন্দুক বহন করেছেন, মাইন পুঁতেছেন এবং পরিখাতে থেকে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন এই কষ্টসহিষ্ণু অনামা ভারতীয় সৈনিকরা। পরিবার পরিজনকে তাঁদের লেখা প্রায় ১০ হাজার চিঠি থেকে বুঝতে পারা যায় কী নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তথা নিঃসঙ্গতার শিকার হয়েছিলেন বিজাতীয় ভূমিতে জীবন-মরণের কাঁটাতারের বেড়ার সামনে প্রতিনিয়ত এসে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়া ওই বীর যোদ্ধারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যথার্থভাবেই জাপান ও জার্মানির হাতে যুদ্ধবন্দি কর্নেল হবিবুর রহমান, মেজর গোলক মিশ্র, মেজর ধীলোঁ, মেজর জেনারেল শাহানওয়াজ খানের মতো অকুতোভয় সৈনিকদের নিয়েই আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুলতে পেরেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

সম্প্রতি গবেষক শান্তনু দাসের লিখিত 'India, Empire and First World War Culture' (লেখক লন্ডনের কিংস কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক) এবং জর্জ মর্টন জ্যাক প্রণীত 'The Indian Empire at War, From Jihad to Victory— The Untold Story of Indian Army at First World War' গ্রন্থদুটিতে প্রথম মহাযুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষমতা উন্মাদনার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া ভারতীয় সৈনিকদের সম্পর্কে অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে— পঞ্জাব, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রত্যন্ত, হতদরিদ্র গ্রামগুলি থেকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে, অস্ত্রচালনাতে অনভিজ্ঞ কৃষকদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দালালরা নিয়ে আসতো। যুদ্ধ চলাকালীন জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্য, শীতবস্ত্র, পানীয় জল, চিকিৎসা আর পুষ্টিকর খাবার এই অপাংক্তেয় কালা আদমি সৈনিকরা পেতেন কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে তাঁদের শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের জন্য বরাদ্দ ছিল দামি জামাকাপড়, বিভিন্ন ভাতা আর পর্যাপ্ত খাদ্য। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়েও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রুধিরাক্ত পরিবেশ শতগুণে বাস্তব ও ভয়াবহ ছিল ওইসব সৈনিক হতে না চাওয়া নিরীহ ভারতবাসীর কাছে। এই ভারতীয় সৈনিকরা যেন প্রত্যেকেই ছিলেন যুদ্ধবিরোধী কবি উইলফ্রেড আওয়েন, হোসে মার্তি ও আর্তুর রিঁবোদের কবিতাতে বর্ণিত মানুষের জীবনহানি ঘটাতে অনিচ্ছুক, ভবিষ্যতের শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখা মানুষগুলি। তাঁরা, বিখ্যাত রোমান কবি—হোরেসের লেখনীতে যুদ্ধের বন্দনাকারী সেই উক্তিটিকে মেনে নিতে পারেননি--- 'Dulce et decorumest propatria mari' (স্বদেশভূমির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া সত্যিই মধুর ও সম্মানজনক)। কেননা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতকে মাতৃভূমি হিসেবে মেনে নিতে অনেকটাই দ্বিধাবোধ করতেন প্রথম মহাযুদ্ধে একার্থে ব্রিটিশদের ভাড়াটে সৈনিক বা 'মার্সিনারি'তে পরিণত হওয়া ভারতীয় সৈনিকরা। এদিকে হায়দরাবাদের নিজাম, বরোদার গায়কোয়াড়, ইন্দোর, মহীশূর, ঝিন্দ, কোচবিহার ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের রাজারা এইসব হতভাগ্য দেশীয় সৈনিকদের সামনে সুখস্বপ্নের জাল বিছিয়ে আলংকারিক ভাষাতে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন, ব্রিটিশ প্রভুদের হয়ে বিজাতীয় রণক্ষেত্রে যদি প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায় তাহলে নাকি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া যাবে।

ফঃ ৬

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনে রাজ্য সরকার উদাসীন কেন?

শ্যামল কুমার হাতি

অনেক বীরের রক্তে রাঙা আমাদের এই স্বাধীনতা। কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত নারীকে তার সিঁদুর মুছতে হয়েছে আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য। কত শিশু অনাথ হয়েছে, কত মানুষের সংসার ভেসে গেছে শুধু এই স্বাধীনতা আনতে। তাদের কথা কি আমাদের স্মরণ করার প্রয়োজন নেই? যে স্বাধীনতার জন্য আমরা এতো বড়ো বড়ো ভাষণ দিতে পারছি, এতো সমালোচনা করছি সরকারি ভাবে সেই স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন চোখে পড়ছে না। আমাদের অতীত গৌরবগাথা সব ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাইতো কীভাবে এবং কেন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হলো তা আজকের প্রজন্ম জানে না।

যতদিন পশ্চিমবঙ্গ থাকবে ততদিন জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক প্রশ্ন থাকবে, 'এটা যদি পশ্চিমবঙ্গ হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই বলতে হবে, মুসলমানরা ভারতে থাকতে চায়নি। তারা তাদের জন্য আলাদা 'হোমল্যান্ডের' দাবি করেছিল। তখন চতুর ইংরেজ, গান্ধীজী ও নেহরু রাজাগোপালাচারীর ফর্মূলা মেনে গোটা বাঙ্গলা ও গোটা পঞ্জাবকে দিয়ে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। এদের চেষ্টায় ফলস্বরূপ হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য গঠিত হয়েছে আজকের পশ্চিমবঙ্গ।

পরে মহাত্মা গান্ধী নেহরুর কথা শুনে বলেন, 'যদি একান্তই দেশ ভাগ করতে হয় তবে চিরশান্তির জন্য লোক বিনিময় করা হোক।' লোকবিনিময় মানে এদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানে যাবে আর ওদেশের হিন্দুরা ভারতে চলে আসবে। ঠিক সেই সময়ে যোগেন মণ্ডল বলেন, 'না আমরা নমশূদ্ররা মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানে থাকবো। যোগেন মণ্ডলরা পাকিস্তানে রয়ে গেলেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। অচীরেই তার ভুল ভাঙে। তিনি শত চেষ্টা করেও পাকিস্তানের নমশূদ্রদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারেননি। তিনি দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। কলকাতা থেকেই তার চোখের জলে ভেজা পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। ঠিক সেই কারণেই কি পশ্চিমবঙ্গ নাম পালটে বাঙ্গলা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে?

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন দেশ গড়ার কথা ছিল তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অসহযোগিতায় তা অথৈ জলে ভেসে যায়। এরা প্রথমেই বলে, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', 'ইয়ে তেরঙ্গা ধোঁকা হ্যায়।' এই কথা যখন লাল পার্টির ছাত্র ও শ্রমিকরা সমানে বলে চলছিল তখন শাসক কংগ্রেস স্বাধীনতার মধু ভোগে ব্যস্ত ছিল।

জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু যে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন কংগ্রেসের অবহেলায় সেই স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' কমিউনিস্টরা হাইজ্যাক করে নেয়। পশ্চিমবঙ্গে তারা অবশ্য 'ছাত্র পরিষদ' নামেই সংগঠন করে। কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের বলে, তোমরা কাজ করলে তোমাদের তো কোনো লাভ নেই। সব লাভ রাজা মহারাজারা নেবে। তখন দেশের বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান রাজা-বড়ো জমিদারের হাতে ছিল। শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের কথা বিশ্বাস করে। যাদের হাতে স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজ ছিল কালক্রমে তারাই পরবর্তীকালে 'কামচোরে' পরিণত হয়। যে শ্রমিক সংগঠন ব্রিটিশ ভারতে শ্রমিকের দৈন্য, শ্রমিকের উপর হওয়া অত্যাচার আন্তর্জাতিক মঞ্চে তোলার জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায় তৈরি করেছিলেন কংগ্রেসের অবহেলায় সেই এআইটিইউসি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে চলে যায়। অনেক পরে কংগ্রেস আইএনটিইউসি গঠন করে।

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে। তখন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। আমাদের সৈন্যদের কলাগাছের মতো ওরা হত্যা করেছিল। ভারত সরকার রেডিয়োর মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য স্বর্ণালঙ্কার চেয়েছিল। দেশের মা-বোনেরাও দেশের প্রয়োজনে তাদের প্রিয় স্বর্ণালঙ্কার দেশকে দান করেছিল। তখন এই কমিউনিস্ট পার্টি লাল শালুতে লিখে মিছিল করেছিল, 'Welcome Chinese Solvation'। ছাত্র-শ্রমিকদের কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচাতে পারছে না দেখে রাষ্ট্রবাদী কিছু শ্রমিকদের নিয়ে ১৯৬৫ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মদিনে ভারতের মধ্যস্থল ভূপালে গঠিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। দত্তপন্থ ঠেংড়িজী হন তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এদের স্লোগান হয়, 'দেশকে হিতমে করেঙ্গে কাম-কামকে লেঙ্গে পুরে দাম।' তাদের গান হলো, 'জন সেবা যে কর্ম আমাদের, ধর্ম আমাদের মানবতা। শোষিত পীড়িত বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য গড়ব মোরা দিলাম কথা।'

আজ কমিউনিস্টের দৌলতেই শ্রমিকদের শুনতে হয়, আসি যাই মাইনে পাই— কাজ করলেই ওভার টাইম চাই। এরা চাকরি চায় সরকারি সংস্থায়। অসুখ হলে নিজের বা প্রিয়জনের চিকিৎসা করায় বেসরকারি হাসপাতালে। বাড়ির ছোটোদের পড়াশোনা করতে পাঠায় বেসরকারি স্কুলে। এরাই আবার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে। বুঝে দেখুন এদের নীতি ও কাজ স্ববিরোধিতায় ভরা। তাই যাদের ডিএনএ-তেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টের রক্ত আছে তারা তো পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব কেন পালন হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলবে না এটাই তো স্বাভাবিক। তারাই তো গণতন্ত্রের জন্য সামান্যতম সংগ্রাম না করে ওমর খালিদদের জন্য গলা ফাটায়। আজ যিনি বৃদ্ধ বয়সেও ওমর খালিদদের জন্য গলা ফাটাচ্ছেন তিনি কম বয়সে জরুরি অবস্থার সময়ে মুখে আঙুল দিয়ে বসেছিলেন। ▯

শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে কোভিড

প্রধানত দুটি কারণে মহিলারা কাজ হারাতে বাধ্য হন অতিমরির সময়ে। প্রথমত, কোভিড পরবর্তীতে পুরনো বেতনে মহিলাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, যেসব বাড়িতে অতিমারির কারণে মৃত্যু ঘটেছে, সেখানে পরিচারিকার বেতন বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

বরুণ দাশ

অতিমারীর লকডাউনে ভারতীয় জনজীবনে যে দুর্যোগ ও সংকট তৈরি হয়েছিল, এখন তা স্তিমিত। করোনার তিনটি বিপজ্জনক ঢেউ নিবিড় সতর্কতার বিধি মেনে, সাধারণ ভারতীয়রা অতিক্রম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। অতিমারীর কারণে কিছু প্রাণহানি স্বীকার করে, কিছু মানুষ অতিমারীতে আক্রান্ত ও সুস্থ হয়ে ছন্দে ফিরেছেন। আমাদের জীবন এখন আবার স্বাভাবিক, আবার কর্মচঞ্চল। ইউক্রেনে সাম্প্রতিক যুদ্ধ, শ্রীলঙ্কার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সংকট, পাকিস্তানের বেসামাল রাজনৈতিক দুর্যোগে ভূরাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠলেও, অতিমারীজনিত সংকট কাটিয়ে উঠবার চেষ্টায় সমস্ত বিশ্ববাসী আজ একজোট।

আজকের কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতি আলোচনায় আমরা প্রধানত কর্মরতা ভারতীয় নারীদের অবস্থা নিরুপণেই সীমিত থাকবো। একথা সকলেই জানেন যে, অতিমারীতে নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যু হয়েছে বেশি। এবং ভারতীয় সমাজে এখন মেয়েদের কাজকর্মের অবস্থা ও পরিস্থিতি ভালো নয়। নতুন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন অফিস, আদালত, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সওদাগরি অফিস, ক্রীড়া ও বিনোদন, চিকিৎসা, পুলিশ ও প্রশাসনিক কাজ যেসব মহিলা, গৃহবধূ, মা ও বোনেরা কর্মরতা, তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও ভারতের মোট কর্মরতা মহিলাদের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য।

ভারতের গরিষ্ঠসংখ্যক মহিলার প্রধান জীবিকাগুলি হলো, কৃষিকাজ, সবজিচাষ, সবজিবিক্রি, গৃহকর্মের পরিচারিকা ও রাঁধুনির কাজ, শিশুরক্ষণাবেক্ষণের কাজ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ, পুলিশ ও রিসেপশনিস্টের কাজ এবং বাচ্চাদের ক্রেস চালনা ও সাংসারিক কাজ। এভাবেই সাধারণ ভারতীয় মেয়েরা জীবিকানির্বাহ করেন এবং সংসার প্রতিপালনে আংশিক সহায়তা করেন। সাধারণ জীবিকার এই

মহিলাদের চুয়ান্ন শতাংশ দু' হাজার কুড়ি সালের চব্বিশ মার্চের পর থেকে কাজ হারিয়ে গৃহবন্দি।

মফস্‌সল থেকে যেমন, গড়িয়া, বাঘাযতীন, সুভাষনগর, মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, পার্ক সার্কাস ও ক্যানটনমেন্ট থেকে যে শ্রমজীবী মহিলারা ট্রেনে করে বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, যাদবপুর, লেকটাউন, সল্টলেক, নিউটাউনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গৃহকর্ম সম্পাদন বা রান্নাবাড়ার কাজ করতেন, অতিমারীর লকডাউন ঘোষণায়, ওইসব শ্রমজীবী মহিলা প্রাথমিকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়েন। ট্রেন বাস বন্ধ থাকলে গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলা কীভাবে তাদের মনিবদের বাড়ি গিয়ে গৃহকর্ম সম্পাদন করবেন? সুতরাং অতিমারীর প্রথমধাক্কায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন গৃহকর্মে নিযুক্ত এইসব মহিলারা।

এছাড়া, সবজিবিক্রেতা, বিড়ি বাঁধার কাজে নিয়োজিত মহিলারা, দরজি, বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিতা মহিলারা, পুলিশ ও নার্সিঙে নিযুক্ত মহিলারা লকডাউনে গৃহবন্দিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অতিকষ্টে তাঁরা দিনযাপন করতে লাগলেন। অতিমারী প্রতিরোধে ডাক্তারদের প্রথম দাওয়াই ছিল, শরীরে ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। দৈনন্দিন আহার ভালো রাখতে হবে। কিন্তু উপার্জন না থাকলে ওরা পুষ্টিকর আহার জোটাবেন কোথা থেকে? সম্পন্ন মানুষ ও সংস্থার অনিয়মিত সহযোগিতায় কখনো কখনো বন্দিজীবনে হাসি ফুটতো কিন্তু যারা সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারতেন না তারা পড়তেন মহাসমস্যায়। ওষুধ কিনবেন না পুষ্টিকর আহার জোটাবেন! এভাবে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অসম লড়াই করে দৈব অনুগ্রহে কেউ টিকে গেলেন, কেউ গেলেন হারিয়ে— এভাবেই চলেছিল।

অন্যদিকে, শিক্ষকতা, প্রশাসনিক কাজে যুক্ত মহিলারা, ডাক্তার, নার্স ও সাইবার প্রযুক্তি নির্ভর মহিলারা গৃহবন্দি হয়ে অনলাইনে অফিস ও শিক্ষকতার কাজ সম্পাদন করলেও কাজের মাসির অভাবে তাদের নিজেদেরই ঘরদোর, জামাকাপড় পরিষ্কার রাখা, তরকারি কাটা এবং রান্নার কাজে নিয়োজিত হতে হলো। সংসারের পুরুষরা এসব কাজে কখনো কখনো তাদের সাহায্য করলেও মেয়েদেরই এসব সামলানোর ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতে হলো। ঘরে-বাইরে দু' ধরনের কজ করতে গিয়ে তারা বেশ হাঁপিয়ে পড়লেন।

করোনার ঢেউ থামলে লকডাউন তুলে নেওয়া হলো। সবজিবিক্রেতা মহিলা ও গৃহকর্মজীবী মহিলারা কেউ কেউ পুরনো কাজ ফিরে পেলেও কোভিডের থাবায় যেখানে জীবনহানি ঘটল, সেখানকার পরিস্থিতি এতো বদলে গেল যে সেখানে কাজ রাখা গেল না। যে বাড়িতে মনিব অতিমারীতে গত হয়েছেন, গৃহকর্মজীবী মহিলারা সেখানে কাজ করবেন কীভাবে?

প্রধানত দুটি কারণে শ্রমজীবী মহিলারা কাজ হারাতে বাধ্য হলেন অতিমারীর সময়ে। প্রথমত, কোভিড পরবর্তীতে পুরনো বেতনে শ্রমজীবী মহিলাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, যেসব বাড়িতে অতিমারির কারণে মৃত্যু হানা দিয়েছে, সেখানে পরিচারিকার বেতন বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

পরিস্থিতি এখন অনেকখানি স্বাভাবিক হলেও অতিমারীর ত্রাস এখনো জাগ্রত। তাই ঘরোয়া কাজ বা ডোমেস্টিক কাজে কোভিড পরবর্তীতে নিয়োগ ভীষণভাবে কমছে। একইভাবে বাড়ির ছোটোদের গৃহশিক্ষকতার কাজে পাড়ার বেকার মেয়েদের যে নিয়োগ ছিল, অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটায় মেয়েদের সেকাজেও এখন ভাটা। গৃহশিক্ষকতায় নিয়োজিত অর্থ এখন অনলাইন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে খরচ হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী অতিমারীজনিত স্বাস্থ্যসংকটে তিন দফায় অপ্রস্তুত অবস্থায়, অপরিকল্পিত ভাবে, ভারতীয় শ্রমজীবী মহিলাদের যেভাবে জীবনসংগ্রামে নামতে হয়, তার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একটা সময় অতিবাহিত করার পর, একইসঙ্গে সংসারে তাদের স্ত্রীর ভূমিকা, কন্যা, মাতা ও দাসীর ভূমিকাও পালন করতে হয়েছে।

যেসব মহিলা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বই লেখেন, অতিমারীর সময়ে তারা নেট থেকে, টিভি এবং বই পড়ে, লেখালিখি এবং গৃহস্থালীর কাজ করে সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু পাবলিশাররা তাদের কাজের মূল্য দেননি এবং লেখিকার নাম দেননি। ফলে অনেকের লেখালিখি বন্ধ আছে।

কবি, লেখিকারা অনলাইন বিদেশি সাইটে লেখালিখি করে যে উপার্জন করেছেন, তা দিয়ে কষ্টে চলবার চেষ্টা করেছেন। এখন মসীজীবীদের খুবিই দুর্দিন, পত্রপত্রিকা ও বইয়ের পাঠক দ্রুত কমছে। লিখে এইসময় উপার্জনের পথ ক্রমশই রুদ্ধ হচ্ছে, তাও লেখালিখিতে মেয়েদের সুযোগ এখনও বেশি। রেলের টিকিট বুকিঙে এখন মেয়েদের নিয়োগ বাড়ছে। তবে রেলে প্রাইভেটাইজেশন বাড়লে মেয়েদের বর্তমান নিয়োগ থাকবে কিনা বলা যাচ্ছে না। সিনেমায় অভিনয়ে, টেলিভিশনে ও টেলিফোনেও মেয়েদের চাহিদা এখন বেশি। লকডাউনের মধ্যেও তাঁরা কাজ করেছেন।

অতিমারীর কারণে অফিস আদালতের কাজকর্মের গতি যেভাবে শ্লথ হয়ে পড়েছিল, এখনও সেই অবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া যায়নি।

নতুন সহস্রাব্দের সূচনা থেকে আমাদের দেশের রাস্তাঘাট, ড্রেন, জলাশয়, পার্ক, স্কুল কলেজ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে যে গতি এসেছিল, দেশকে তৃতীয় বিশ্বের থেকে দ্বিতীয় বিশ্বে নিয়ে যাওয়ার যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল ও উন্নয়নের কাজে যে গতি এসেছিল, আমাদের নাগরিক জীবনে হাইটেকের পরশে যেভাবে ঝকঝকে ও চকচকে করার প্রতিযেগিতা শুরু হয়েছিল, লকডাউনের ধাক্কায় তার ক্ষতি হয় প্রবলভাবে। দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করার ছন্দ আবার ফিরে আসবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং জিনিসপত্রের দাম এখন যে হারে বাড়ছে, তা সামনে আরও কঠিন দিনেরই ইঙ্গিত। এভাবে আমরা দু' হাজার বাইশ সাল অতিক্রম করতে পারলে আমাদের জীবনযাপন ও বেঁচে থাকা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

চল্লিশ লক্ষ অসমীয়ভাষী মুসলমানকে 'মূলনিবাসী' স্বীকৃতি দিল অসমের বিজেপি সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা।। গত ৫ জুলাই অসম সরকার রাজ্যের ৪০ লক্ষ অসমীয়ভাষী মুসলমানকে স্থানীয় নাগরিকের স্বীকৃতি দিল। এই বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের ৫টি গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে অসম প্রশাসন। এই মর্মে প্রকাশ করা হয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তি। তাতে বলা হয়েছে, অসমে বসবাসকারী যেসব মুসলমানদের অতীতে পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে অসমে আসার কোনও অভিবাসন ইতিহাস নেই, তারাই কেবল অসমের স্থানীয় বাসিন্দার স্বীকৃতি পাবেন। রাজ্য সরকারের তরফে অসমের 'মূলনিবাসী' পরিচয়পত্র দেওয়া হবে এই মুসলমানদের। আগে অসমীয় ভাষায় কথা বলা মুসলমানরা অসমের স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবেই চিহ্নিত হতেন। কিন্তু এতদিন নির্দিষ্ট কোনও সরকারি পরিচয়পত্র তাদের ছিল না। সম্প্রতি হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার অসমীয়ভাষী মুসলমানদের স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আসা বাংলায় কথা বলা মুসলমানরা এক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতির আওতায় পড়বেন না।

লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পর অসমেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলমানদের বাস। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে অসমের মোট জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশই হলো মুসলমান। তাদের মধ্যে স্থানীয় অসমীয়ভাষী মুসলমান জনসংখ্যা ৩৭ শতাংশের কিছু বেশি। অসমের স্থানীয় মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরেই অসমীয়ভাষী হিসেবে নাগরিকত্ব পাওয়ার দাবি করছিল। এবার তাদের সেই দাবিকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার মন্ত্রীসভা।

এই প্রসঙ্গে অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রী কেশব মহান্ত জানিয়েছেন, ''মন্ত্রীসভা অসমের মুসলমানদের গোরিয়া, মোরিয়া, জোলা, দেশি

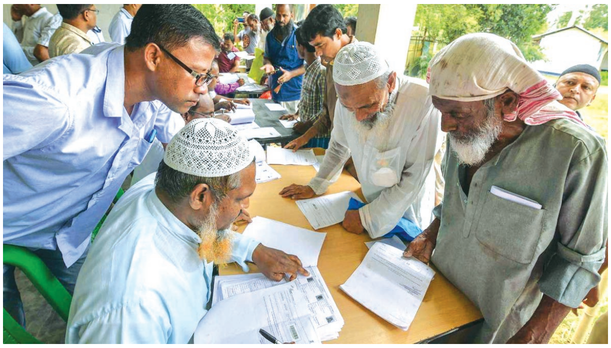

ও সৈয়দ— এই প্রচলিত পাঁচ গোষ্ঠীকে মূলনিবাসী অসমীয় মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।''

প্রসঙ্গত, অসমীয়ভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গঠিত ৭টি উপকমিটি গত ২১ এপ্রিল গুয়াহাটির জনতা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছে তাদের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন জমা দেয়। সেখানে অসমের মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্তা ও মূলনিবাসী সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতিপ্রদান এবং তাদের জাতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে একটি আদমশুমারি করার সুপারিশ করা হয়। তার প্রেক্ষিতেই বর্তমান অসম সরকার এদিন ৪০ লক্ষ অসমীয়ভাষী মুসলমানদের অসমের মূলনিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ''রাজ্যের মূলনিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরাও রয়েছেন এবং তাদের অস্তিত্ব সরকার মেনে নিচ্ছে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপকমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।''

চতুর্থ ট্রায়াল পাশ করল আইএনএস বিক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা।। ভারতীয় নৌসেনার ইতিহাসে সংযুক্ত হলো নতুন অধ্যায়। চতুর্থ ট্রায়াল পাশ করল ভারতীয় সেনার অন্যতম গর্ব আইএনএস বিক্রান্ত। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আইএনএস বিক্রান্ত ভারতের প্রথম বিমানবাহী রণতরী। আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকে সমুদ্রে কমিশনড হবে আইএনএস বিক্রান্ত। বিক্রান্তের অন্তর্ভুক্তি নৌসেনাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এর আগে একমাত্র ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের কাছেই এমন রণতরী ছিল। এবার ভারতের নামও সেই তালিকায় জুড়ল।

মিগ ২৯কে যুদ্ধবিমান ছাড়াও কামোভ ৩১ হেলিকপ্টার, এমএইচ ৬১ মাল্টি রোল হেলিকপ্টার এই রণতরী থেকে রওনা দিতে পারে। ২০০৯ সাল থেকে এমন রণতরী তৈরি হওয়ার পর এই প্রথম এবছর ১৫ আগস্ট থেকে আইএনএস বিক্রান্তকে জলসীমায় নামাচ্ছে ভারতীয় নৌসেনা।

উদয়পুর কাণ্ডে মুসলমানদেরও প্রতিবাদ করা উচিত ছিল ঃ সুনীল আম্বেকর

নিজস্ব সংবাদদাতা।। উদয়পুরের হিন্দু দর্জিকে হত্যার ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। সম্প্রতি রাজস্থানের উদয়পুরে দুই জেহাদি মুসলমান আইসিস কায়দায় গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করে এক হিন্দু দর্জিকে। কানহাইয়ালাল নামে ওই ব্যক্তি নূপুর শর্মার মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। তার জেরেই প্রকাশ্য দিবালোকে দু'জন জেহাদির হাতে খুন হতে হয় তাকে।

এই ঘটনায় দেশজুড়ে সাংবিধানিক পথে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছে হিন্দুরা। আরএসএস মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর এই প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলমানদেরও উচিত ছিল হিন্দুদের পাশে থেকে এই ধরনের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ করা ও বিক্ষোভে শামিল হওয়া। ভারতীয় হিসেবে একযোগে এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।"

গত ৯ জুলাই রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে অখিল ভারতীয় প্রান্ত প্রচারকদের তিনদিন ধরে চলা বৈঠক শেষ হয়। এদিন ওই মঞ্চ থেকেই তিনি উদয়পুর ও অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করেন। শনিবার বৈঠকের শেষদিনে সঙ্ঘের সাংগঠনিক প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'আরএসএসের শাখার সংখ্যা বর্তমানে ৫৬ হাজার ৮২৪। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২০২৫ সালে সঙ্ঘের একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উৎসব কীভাবে উদ্‌যাপন করা হবে তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, স্থির হয়েছে দেশজুড়ে সঙ্ঘের এক লক্ষ শাখা খোলা হবে। সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে আরএসএস।

উদয়পুরের ঘটনা প্রসঙ্গে সুনীল আম্বেকর আরও বলেন, "মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণের আবেগের বিষয়টাও খেয়াল রাখতে হবে।" তাঁর মতে এদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রাধান্য আছে। সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে। যদি কারও কিছু পছন্দ না হয়, তবে গণতান্ত্রিক পথেই তা প্রকাশ করা উচিত। খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাসে কোনও কিছুর সমাধান হয় না। মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র হিন্দুরাই প্রতিবাদ করেছে। আর কিছু বুদ্ধিজীবী পথে নেমেছেন। দেশের কথা ভেবে, দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য পালন করে মুসলমান সম্প্রদায়কেও উদয়পুর ও অমরাবতী হত্যার প্রতিবাদ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন আরএসএস মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলে প্রমুখ নেতৃত্ব ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে ইন্টারনেটের জনক প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা।। প্রয়াত হলেন ভারতের ইন্টারনেটের জনক বিজয়েন্দ্র কুমার সিঙ্ঘল। তাঁর হাত ধরেই ভারতের ইন্টারনেট মাধ্যমে জোয়ার এসেছিল। পেশায় আইআইটি ইঞ্জিনিয়ার বিজয়েন্দ্র কুমার নিজের প্রচেষ্টায় স্থাপন করেছিলেন ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানি ইনমরস্যাট। ১৯৯১ সালে তিনি ভিএসএনএলের দায়িত্ব নেন। তাঁর জন্যই ভারতের ইন্টারনেট যোগাযোগ মাধ্যম এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। মৃত্যুর সময় তাঁর

বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। বিজয়েন্দ্র কুমার সিঙ্ঘলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে দেশজুড়ে।

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার এগারো জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমর্থন চেয়ে কলকাতায় দ্রৌপদী মুর্মু' শীর্ষক একটি খবরে লেখা হয়েছে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ৯ জুলাই কলকাতায় এসেছিলেন। সঠিক তারিখ ১১ জুলাই। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—স্ব: স:।

চিনের ওপর নজরদারি বাড়াতে মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনা

নিজস্ব সংবাদদাতা।। মান্দারিন ভাষার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। পূর্ব লাদাখে ইন্দো-চীন সীমান্তে চলতে থাকা সমস্যার মধ্যেই মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দু'বছর আগে গালওয়ান উপত্যকায় দুদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এরপর দুই দেশের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা একাধিকবার আলোচনায় বসেন। চীনের আধিকারিকদের অধিকাংশই নিজেদের মধ্যে মান্দারিন ভাষায় কথোপকথন জারি রেখেছিল। সেই সময় মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ভারতীয় শিবির।

এছাড়াও চীন সীমান্তে চীনা সেনাবাহিনীকে নিজেদের কথা পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যও ভারতীয় সেনাদের মান্দারিন ভাষা জানা প্রয়োজন বলে মনে করছেন ইন্ডিয়ান আর্মির শীর্ষ আধিকারিকরা। মান্দারিন ভাষা জানা থাকলে ভারত-চীন বাহিনীর কোর কমান্ডার পর্যায়ে আলোচনা, ফ্ল্যাগ মিটিং বা যৌথ সামরিক মহড়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। এই সব কারণে মান্দারিন ভাষার ওপর জোর দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সম্প্রতি মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তাতে জানানো হয়েছে, ৫ জন সাধারণ নাগরিক ও একজন প্রাক্তন সেনা আধিকারিককে মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

বিশেষ সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের পঞ্চমড়িতে সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুল ও দিল্লির স্কুল অফ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেনারা মান্দারিন ভাষা ঠিকঠাক আয়ত্ত করতে পারছে কি না তাও পরখ করে দেখবে মান্দারিন ভাষা বিশেষজ্ঞরা।

কমনওয়েলথ গেমসে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত

নিজস্ব সংবাদদাতা।। বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসে প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। কমনওয়েলথ গেমসে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের মেয়েদের টিম ঘোষণা করা হলো সোমবার ১১ জুলাই। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর। ১৫ জনের টিমে রয়েছেন দুজন উইকেট কিপার।

পশ্চিমবঙ্গের উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। মূল দলে রিচার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। এজবাস্টনে ভারতের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৯ জুলাই। ৩১ জুলাইয়ের ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। গ্রুপের শেষ ম্যাচ বার্বাডোজের বিরুদ্ধে ৩ আগস্ট।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৭ ।।

লেখাপড়ায় খুব ভালো বলে সবাই তাঁকে ভালোবাসেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ভালোভাবে পাশ করে নবম শ্রেণীতে উঠলেন। এই সময় শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন।

স্কুল পালিয়ে প্রায়ই বনে গিয়ে বালক বঙ্কিম ভাবাবেশে কীর্তন করতেন। ঈশ্বরকে ডাকতেন।

(ক্রমশ)